Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও রবীন্দ্রনাথ

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সনৎকুমার সাহা
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).2
Pages	১৭-৩৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও রবীন্দ্রনাথ

সনৎকুমার সাহা*

Check for updates

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের ভেতর যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এটা যে তখন কোনো নতুন প্রসঙ্গ ছিল, তা নয়। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেও টুকটাক অভিযোগ-আলোচনা এখানে-সেখানে কেউ কেউ করেছেন। পত্র-পত্রিকাতেও মাঝে মাঝে তার দেখা মিলেছে। আবার মিলিয়েও গেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বয়ংপ্রভ-সার্বভৌম ভাবমূর্তিই স্থায়ী হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেব বসুর আপাত-নিরীহ একটি রচনা চারদিকে তুমুল হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল। 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী'[১] নামে লেখাটি প্রথম ছেপে বেরোয় ১৯৬০ সালে। তখন খুব একটা কারো নজরে পড়েনি। অবশ্য তার আগে ওই বছরেই 'আকাশবাণী'র 'The Indian Listener' মুখপত্রে তাঁর 'Western Influence on Bengali Literature : Rabinadranath' ছাপা হয়। বাংলা রচনাটি মোটামুটি ইংরেজির অনুসরণ; কোথাও বা একটু-আধটু সম্প্রসারণ। পরে ইংরেজি-বাংলা, দু'ভাষাতেই লেখাটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে বার কয়েক। প্যারিসের ইঙ্গ-ফরাসি পত্রিকা Two Cities-এও। ১৯৬১তে সম্ভবত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকের কারণে, অন্য সময়ের তুলনায় তা বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। হয়ত একই কারণে প্রতিক্রিয়াও তীব্রতর হয়েছে। শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রতিমা অতিমানবিক বিভূতি ছড়ায়। আত্মশ্লাঘাও বাংলাভাষী জনগণের বাড়ে। এই পরিমণ্ডলে, তিনি যে পাশ্চাত্যের অনুগামী ছিলেন, এবং তাঁর সুকৃতি অনেকাংশেই তার পরিণাম ফল, কোনো লেখা থেকে যদি এমন ধারণার সৃষ্টি হয়, তবে তার পাঠক-আনুকূল্য পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ হবারই কথা। হয়ত তেমনই। প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানের ঝাঁঝ ক্রমশ বাড়ে। তর্ক-বিতর্ক তুমুল হয়ে ওঠে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদেরও মতামত দেবার প্রয়োজন পড়ে।

আজ রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতজন্মবর্ষে বিষয়টির দিকে একবার ফিরে তাকাই। হয়ত সময়ের বাড়তি দূরত্ব আমাদের দৃষ্টিকে তুলনায় স্বচ্ছ করবে। এবং নিরাসক্ত। অবশ্য সর্বজ্ঞ হতে পারি না। বাস্তবও ভোল পালটায়। নতুন মাত্রা যোগ হয়। পুরনো প্রত্যয় ভেঙে পড়ে। অথবা তার রং চটে যায়। তবু পুরনো ভাবনা ঝালাই করার — এবং যাচাই করার সুযোগ একটা হয়। সেই সুবাদেও প্রসঙ্গটি আবার সামনে আনি। কোনো চূড়ান্ত মত খাড়া করার জন্যে নয়, এখন কী ভাবছি, সেইটে, এবং সেইটুকুই জানাবার জন্য। তা নিছক ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, মানুষের জানাশোনার জগৎ নৈর্ব্যক্তিকভাবে, যতটা পারা যায়, বোঝার চেষ্টা থেকে। ফাঁক-ফোকর তাতে থাকবে না, এমন দাবি করি না। ভুলভ্রান্তিও নানা পথে ঢুকে পড়ে বহাল তবিয়তে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে পারে।

আমরা প্রথমে বুদ্ধদেব বসুর কথা শুনি। প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত পেরিয়ে ফয়সালা কি মেলে তাও দেখি। পরে বিষয়টি নিয়ে, যেমন বলেছি, নিজেদের মতো আবার ভাবি।

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

দুই

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী' প্রবন্ধ শুরু করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে সাক্ষী মেনে। প্রথম বাক্যেই পড়ি 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম য়োরোপীয় সাহিত্য লেখেন'। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তিতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এই অতিরঞ্জন ঠিক সেই ধরনের, যা বিদ্যুতের মতো সত্যকে উদ্ভাসিত করে আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে'। (বুদ্ধদেব, ১৯৬৩ : ১৫১)। তাঁর এই প্রস্তাবনা যে রোষানলে পড়তে পারে, পরের টিপ্পনিতে তিনি নিজেই তা খুঁচিয়ে তোলেন। তিনি বলেন, প্রাচীনপন্থী রবীন্দ্রভক্তরা তো বটেই, এমনকি তরুণ যাঁরা ঘরে ফেরায় ব্যস্ত, এবং মঙ্গলকাব্যেই খুঁজে পান বাংলা উপন্যাসের উৎস, তাঁরা কেউই তাঁর কথাটিকে গুরুত্ব দেবেন না। রবীন্দ্রনাথকেই বরং তাঁরা সাক্ষী মানবেন। কারণ, পাশ্চাত্যে তাঁর পরিচয় ছিল তিনি প্রাচ্যদেশের ঋষি। এবং সেই পরিচয় তাঁকে বিব্রত করেনি, তিনি তাতে স্বচ্ছন্দই থেকেছেন। তারপরেও, তিনি বলেছেন, ' ইয়োরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে সুধীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যে একটি সত্যের বীজ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।' এবং জোরের সঙ্গে যোগ করছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সেই ভূতলবর্তী মনোলোক, তাঁর কবিসত্তার যা ভিত্তিভূমি – আমি বলতে চাই যার বড়ো একটি অংশ য়োরোপের অন্তর্ভূত'। (বুদ্ধদেব, ১৯৬৩ : ১৫১-১৫২)

তবে তিনি মনে করেন, এই সত্যকে অবদমনের চেষ্টাও ছিল কবির ভিতরে নিরন্তর। পাশ্চাত্যে তিনি সচেতনভাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন প্রাচ্যের ধ্যান-ধারণার এক সর্বতোভদ্র শোভন প্রতিনিধি হিসেবে। বেশভূষায়-আচার-আচরণে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারতের সাধু-সন্তের বৈশিষ্ট্য, যা পশ্চিমি জীবনচর্চার প্রকাশ্য রীতিনীতির ঠিক বিপরীত। শ্রেষ্ঠত্বের আবরণ যেন একটা তিনি রচনা করেছেন নিজেকে ঘিরে। আত্মসম্মানের বর্ম হিসেবেও ব্যবহার করেছেন তাকে। অবশ্যই তা সমীহ আদায় করেছে। কিন্তু অনিবার্য দূরত্বও তৈরি হয়েছে একটা। ইয়োরোপ-আমেরিকায় প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে অব্যাহত দ্রুতি ও ব্যস্ততা তাঁকে আরাম দেয়নি। সেসব জায়গায় গিয়ে বার-বার তিনি গৃহকাতর হয়ে পড়েছেন। ফিরে যেতে চেয়েছেন বাংলায় তাঁর শান্ত-নিভৃত কোণটিতে। পাশ্চাত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদ, অসহিষ্ণু রাষ্ট্রনীতি ও অসংযমী সম্পদস্পৃহা তিনি অনুমোদন করেন নি। ওই ভূখণ্ডে বসেই উচ্চকণ্ঠে তাদের ধিক্কার জানিয়েছেন। ক্ষমতার আনুকূল্য তা পায়নি। তিনিও উপেক্ষার শিকার হয়েছেন। তবু আত্মমর্যাদাবোধ তিনি বিসর্জন দেননি। ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীনতার মর্মযন্ত্রণা ও মুক্ত স্বদেশের স্বপ্নকল্পনা তাঁকেও আন্তরিকভাবে আলোড়িত করেছিল। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে স্বদেশমুক্তির সাধনায় সবাইকে তিনি একত্র হবার ডাক দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন, উদার উন্মুক্ত চিত্তে য়োরোপের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির মর্মবাণীর সঙ্গে তাঁর অকুণ্ঠে একাত্ম হবার পথে তা অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। কারণ, ওই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ছিল য়োরোপ-মানসেরই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। নীটফল দাঁড়ায় এই, তিনি তাঁর য়োরোপমুখী মনোভাবকে আড়ালে রাখেন, অথবা, তা রাখতে বাধ্য হন যদিও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে তার প্রভাব একেবারে মুছে ফেলা যায় না। এমন কি কখনো কখনো তিনি বিপরীত মন্তব্য করে থাকলেও তাঁর রচনাই তার প্রতিবাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এভাবে দেখলে মানতে হয়, ভারতীয় ঐতিহ্যের যে

ভাবরূপে তিনি ছিলেন, অথবা যার সমষ্টিগত উত্তরাধিকার বহন করা তিনি মনে করেছিলেন তাঁর নৈতিক দায়িত্ব, তাঁর সাহিত্য রচনায় তার অনুসরণ ছিল স্বাভাবিক ও প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর মনের গতি ছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে পশ্চিমমুখী, এবং তারই অনিবার্য তাগিদে যে সাহিত্য-সৃষ্টি, যে অস্থিরতার ও যন্ত্রণার নান্দনিক উদ্ভাস, তাতেই মেলে তাঁর অনাবরণ সত্য-স্বরূপ; এবং সেখানেই তাঁর কীর্তি তুলনারহিত; সুদূরপ্রসারী তার মায়া। সংযোজিত মূল্য অক্ষয় থেকে যায়। বুদ্ধদেব বলছেন, "রবীন্দ্রনাথ" বলতে যে-ধারণাটি ধীরে ধীরে লোকচিত্তে গড়ে উঠেছিলো, তার সঙ্গে বাইরের দিক থেকে নিজেকে তিনি আক্ষরিকভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন; সেখানে তিনি সুস্মিত ও করুণাশীল ঋষি, ও সংরক্ত, সেখানে অন্ধকারে ঢেউ তুলছে বেদনা, দিগন্তেও নিশ্চয়তা নেই — অর্থাৎ অন্যদিকে তাঁকে 'ইয়োরোপীয়' বললে ভুল হয় না, ভুল হয় না উনিশ-শতকী রোমান্টিকতার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বলে ভাবলে।' (বুদ্ধদেব, ১৯৬৩ : ১৫৭-১৫৮)

তবে রোমান্টিকতার একটা সংকীর্ণ কালখণ্ড পেরিয়ে ইয়োরোপীয় ভাবনা-বলয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কতদূর প্রসারিত হয়েছিল, বলা শক্ত। বুদ্ধদেবের মনেও এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। যদিও তিনি মনে করেন, কবির মনে ঢেউ তোলায় অখণ্ড অভিনিবেশ বা মনোযোগী অনুশীলন অপরিহার্য নয়। শব্দ-বর্ণ-রূপ-বা ছন্দের বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গের একটি কণাই তাঁর কল্পনা-প্রতিভা ও চিন্তা-প্রতিভাকে সক্রিয় করে তোলায় যথেষ্ট। তারপরেও রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকে এসে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ধারা থেকে কতটুকু আহরণ করেছেন, তার হদিস মেলা ভার। আগের পর্বেও বোদলেয়র বা র‍্যাঁবো তাঁর মনে কোন আগ্রহ জাগিয়েছে, এমন কিছু আমরা জানি না। বরং তাঁদের পেরিয়ে আপাতদৃষ্টে তাঁদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়েই *গীতাঞ্জলির* পদাবলী দিয়ে ইয়োরোপীয় চিত্তভুবনকে তিনি সাময়িকভাবে বশীভূত করেছেন। কিন্তু তারপরেই ইয়োরোপ অসংশোধনীয়ভাবে ভিন্ন দিকে বাঁক নিয়েছে। তখন এলিয়ট, এমিলোয়েল বা এজরা পউন্ড তিনি পড়েছেন ঠিকই – এবং তা সম্ভবত ইংরেজি ভাষায় তাঁর আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যের কল্যাণে তাকে ছাড়িয়ে ইয়োরোপীয় মূল ভূখণ্ডের কোন কবির কবিতা তাঁকে কৌতূহলী করেছে বলে আমরা জানতে পারি না — কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে তিনি নিজেকে মেলাতে পারেননি; কাব্যকলায় নিজের দূরত্ব তিনি বজায় রেখেছেন। (বুদ্ধদেব, ১৯৬৩ : ১৫৩-১৫৪)

তারপরেও, বুদ্ধদেব মনে করেন, তাঁর কবিতা যে কপালে অসামান্যের তিলক পরেছে, তার প্রকৃত কারণ হলো, মনসা-কর্মণা তিনি ইয়োরোপীয় হয়ে আপন ভাষায় ওই ইয়োরোপীয় ভাবের যথার্থরূপ ফুটিয়ে তুলে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। হতে পারে এই ভাব প্রবল ছিল উনিশ শতকের প্রথমভাগের রোমান্টিক আন্দোলনে। খোদ ইয়োরোপে ভাটার টানে স্রোত তার প্রায় নিশ্চিহ্ন। 'মরা নদীর সোঁতাটুকু কেবল ওই স্রোতস্বরের প্রতিধ্বনি স্মৃতিতে জাগায়। কিন্তু বাংলায় তার বিলম্বিত ও প্রলম্বিত প্লাবন তখনও উত্তাল। রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ মহিমায় গণ্ডুষে পান করেন তার অমৃত বারি। এবং তার প্রতিফলন ঘটে সরাসরি তাঁর কবিতায়। তাতে ভান থাকে না এতটুকু। 'প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ' ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ') অনিরুদ্ধ ছাড়া পায়। শুধু কবিতায় নয়, গল্প-উপন্যাসেও।

আমরা জানি তাঁর ভারতীয় পরিচয়ের মর্যাদা নিয়ে তিনি বরাবর স্পর্শকাতর ও সতর্ক থাকলেও য়োরোপীয় রোমান্টিক গোত্রভুক্ত হওয়া নিয়ে তাঁর মনে কোনো বিরূপতা ছিল না; উলটো শেলী-কীটসের তুল্য বলে সুধীমহলে তাঁর স্বীকৃতি মিললে তিনি তাতে খুশিই হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের কথা তিনি গোপন করেননি। *ছিন্নপত্রের* এক চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে তিনি লিখছেন, '... আমি যত ইংরেজ কবি জানি সবচেয়ে কীটসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই। ... কীটসের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে — যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৭ : ৫১৩)। এরই বিপরীতে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের কবি টেনিসন ও সুইনবরন তাঁর সমীহ আদায় করলেও তিনি তাঁদের আপন মনে করেননি। তাঁরা তাঁর কাছাকাছি সময়ের। কিন্তু ওই সময়ের মেজাজ ততদিনে যেভাবে বদলে যায় — এবং তা নির্দিষ্ট করে ইংরেজদের বেলায় — তাতে কবিতাও তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারায়। ওই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরো যোগ করছেন, 'টেনিসন সুইনব্‌রন্ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে খোদা ভাব আছে — তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর করা সত্য পাঠ লিখে দেয় না। ... টেনিসনের অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। কীটসের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলা-নৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। (দ্র. রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৭ : ৫১৩)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব তখন শিখরচূড়া স্পর্শ করেছে। তার অহংকার ও গাম্ভীর্য ইংরেজ ব্যক্তিচেতনাকেও একটু একটু করে ছেয়ে ফেলছে। দূরত্ব একটা তাতে তৈরি হয় বই কি। শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান সাহিত্যেও ফুটে ওঠে। টেনিসনে তার আভাস মেলে। ম্যাথ্যু আর্নল্ডও ছিলেন অতিরিক্ত আত্মসচেতন। আর রোমান্টিক ভাবনা-কল্পনা ক্রমশ থিতিয়ে যায়। শেলী-কীটসের সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ যদি এই পরিমণ্ডলে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে থাকেন, তবে তাতে অবাক হবার কিছু দেখি না। মানসিক নৈকট্য গড়ে উঠেছিল তাঁর ইয়েট্‌স্-এর সঙ্গে। সেটা যে ঘনিষ্ঠতর হয়নি, তার পেছনে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। দেশে-দেশে ঔপনিবেশিক সম্পর্কের জটিলতাও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। এবং তা ছিল বহুমাত্রিক। বিশেষ করে ইয়েট্‌স্-এর দিক থেকে। বুদ্ধদেব বসু এই বিষয়গুলো খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছেন কি না জানি না। আমরা দেখি, তিনি আক্ষেপ করছেন, '... প্রথম যৌবনে যে-সব কবি তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) মুগ্ধ করেছিলো, প্রবীণ বয়সেও উত্তম কবির নিদর্শনরূপে তাঁদেরই তিনি স্মরণ করেছেন। এই নিশ্চলতা কেমন করে সম্ভব হলো তা ভেবে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এ কি তাঁর চরিত্রের অনাক্রমণীয় অবৈকল্যের প্রমাণ, না কি তাঁর এই লক্ষণ আমাদের এ কথা বলার অধিকার দিচ্ছে যে তাঁর প্রতিভার প্রবণতা শুধু সম্প্রসারণের দিকে পরিণতির সম্ভাবনা তাতে ছিলো না?' (বুদ্ধদেব, ১৯৬৩ : ১৫৫)। একথা সত্য, জীবনের

শেষ প্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথ কবুল করেন, 'তবু আমি জন্ম-রোম্যান্টিক', (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪ : ৭৩১) পাশ্চাত্যের সাহিত্যে যে পালাবদল ঘটে চলেছে, যেখানে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষের বিভীষিকা, তার সঙ্গে তিনি তাল মেলাতে পারেননি। তাল মেলাতে চানওনি। ইয়োরোপীয় রোম্যান্টিক ধারার অনুসরণে তিনি তাঁর কীর্তির সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু পরে এই বিচ্ছেদ বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে তাঁকে প্রায় অপাঙক্তেয় করে ফেলেছে।

বুদ্ধদেব অবশ্য মনে করেন, পাশ্চাত্য ভাবনার নব তরঙ্গ তাঁর মনে তুফান বইয়ে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সাহিত্যে তার স্পষ্ট সঞ্চালন ঘটেনি। প্রাচ্য ঋষির যে ভাবমূর্তি তাঁর গড়ে উঠে জমাট বেঁধেছিল — দেশে এবং বিদেশে — তা ভেঙে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে একরকম অসাধ্যই ছিল। তিনি তাঁর অতীতে মনগড়া-সমীকরণেই বন্দি ছিলেন। বাস্তব ওই সমীকরণের পরিপুষ্টি ঘটায়নি। আমরাও দেখি, সাহিত্যের চ্যালেঞ্জ তিনি মোকাবিলা করেন না। *গীতাঞ্জলির* অনুবাদের অভাবিত সমাদর ও তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সাহিত্যে তিনি কী দিকনির্দেশনা দেন, তা জানবার জন্য গোটা বিশ্বই উন্মুখ হয়ে ছিল। ইয়োরোপ-আমেরিকায় তিনি এগিয়েছেনও তারপর বেশ ক'বার। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো বিতর্কে তিনি জড়াননি। গণমাধ্যমে মুখ খুলেছেন কদাচিৎ। পক্ষান্তরে মানুষের ধর্ম, ন্যায়-অন্যায় কল্যাণ-অকল্যাণ, এসব বিষয়ে তাঁর ঐতিহ্য-লালিত উপলব্ধির বাণী তিনি শুনিয়ে গেছেন ক্লান্তি হীন। মানুষ তাঁকে মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধা করেছে। কিন্তু আধুনিক কাব্য-কলার প্রতিভূ তিনি হননি। বিষয়টিই মনে হয় তাঁর কাছে অবাস্তব অথবা নিরর্থক ঠেকেছে। যদিও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন ভাবনা তিনি তাঁর মতো করে ভেবে চলেছেন।

এই যে বিশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুঃখ বিষাদ হতাশা হাহাকারের কালিমালিপ্ত ধারাপাত, নাস্তিক্যবোধে বিপর্যস্ত নিরবলম্ব মানুষের পরিত্রাণহীন আত্মিক সংকট, এসবের অভিঘাত তাঁর ওপরেও যে পড়েছিল, এবং তা ওই পাশ্চাত্যের সাহিত্য-শিল্পকলার নবনব অভিব্যক্তির মুখোমুখি হতে হতেই, তার পরিচয়, বুদ্ধদেবের ধারণা, ধরা পড়ে সাহিত্যকর্মের অভ্যস্ত অঙ্গনে তেমন না হলেও জীবনসায়াহ্নে অতি অভ্রান্তভাবে ছবি আঁকার নতুন ভুবনে তাঁর ক্লান্তিহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। 'তাঁর ছবিতে ভিড় করে আসে কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা, 'খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, কাঁটার মতো, অদ্ভুত ও বিকৃত মুখের মেলা বসে গেছে সেখানে, ভেসে উঠেছে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, স্বপ্ন থেকে ছেঁকে তোলা অতিপ্রাকৃত ভূদৃশ্য, বর্ণলেপনে যেন শোণিতের রক্তিমা উপচে পড়ছে। ... এ-কথা আমরা মানতে বাধ্য যে স্বীয় পরিবার বা গোষ্ঠীভুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দনাল বসুর ধরনে ছবি আঁকার কোনো চেষ্টা অথবা ইচ্ছে আমরা রবীন্দ্রনাথে খুঁজে পাই না একমাত্র ইয়োরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্টদের সঙ্গেই তাঁর কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে।" (বুদ্ধদেব, ১৯৬৩ : ১৬০)। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকেই তিনি সাক্ষী মানেন। নির্মলাকুমারী মহলানবীশকে লেখা এক চিঠিতে কবি লেখেন, "আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালী নই — আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটিরই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।" (বুদ্ধদেব, ১৯৬৩ : ১৬০-৬১)

সব মিলিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যে ঝোঁকটা পড়ে এইখানে যে পাশ্চাত্যের সৃষ্টিশীল ধারায় একাত্ম হতে পারার ফলেই রবীন্দ্র-প্রতিভার অর্থবহ বিকাশ যেমন যা হবার হয়েছে। ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আন্দোলন তাঁর ফলবান সাহিত্য-কর্মের প্রেরণা। এই সাহিত্য-কর্ম ইয়োরোপীয় ভাবনা-বিশ্বে মূল্যসৃজনের পরবর্তী ধারাকে অনুসরণ করতে পারেনি। সেই অনুপাতে তা পৌনঃপুনিক ও নিষ্ফল। কিন্তু শেষ প্রহরে সৃষ্টির আগুন তাঁর ভিতরে আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে। তা ঝলসে ওঠে ছবি আঁকায়। এও সম্ভব হয় সমকালীন ইয়োরোপীয় ধ্যান-ধারণা তিনি নিজের করে নিতে পারেন বলে।

বুদ্ধদেব বসুর কথা যে খুব বৈপ্লবিক ছিল, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের উত্তরাধিকার অকপটে স্বীকার করেছেন; এমন কি, জীবনের শেষ বেলাতেও যখন স্বদেশী আবহাওয়ায় ইংরেজ-বিচ্ছিন্নতাই ছিল গৌরবের। প্রথম পর্যায়ে অবশ্য ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিই মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য য়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথও সেদিকে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। অনেক পরে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁকে বোদলেয়র-পাঠে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। সফল হননি। কিন্তু এই মহিলাই তাঁকে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার রাজ্যে নিয়ে আসেন। সচেতনভাবে চিত্রকর তিনি হয়ে ওঠেন গুণবতী ওই বিদেশিনীর প্রণোদনায়। ইয়োরোপীয় হবার জন্যে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত সহজ মুক্তির জন্য — রেখা ও ছন্দের চিত্তেরও মুক্তি। ছবি আঁকায় তাঁর অধিকার নিয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল। ওকাম্পো তাঁকে সাহস জোগান। তিনিও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। নিজের মতো এঁকে চলেন। রেখায় জোর ও লাবণ্য, দুই-ই ফোটে। (দ্র. মাহমুদ ২০১১)। ইয়োরোপীয় অভিব্যক্তিবাদীদের অনুকরণে তিনি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন, এ ধারণা যথার্থ মনে হয় না। বড় জোর এমন হতে পারে, — এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক — ইয়োরোপের বিভিন্ন চিত্রশালার প্রদর্শনীতে তিনি এই ধরনের যে সব ছবি দেখেছেন, তাদের রূপ ও ছন্দ তাঁর স্মৃতিতে সঞ্চিত ও ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে চলছিল। তিনি তাদের সহজ প্রকাশে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি। ছবিতে ও কবিতাতে অবচেতন ও পরাবাস্তব মূর্ত করে তোলার প্রয়াস তখন চোখে পড়ছিল ইয়োরোপের শিল্পভুবনে। রবীন্দ্রনাথের ছবিকে তারা আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু তাঁর ছবিতে রেখা, কল্পনা ও ছন্দের স্বাধীনতা একান্তই তাঁর চৈতন্যপ্রসূত। তারপরেও স্থান ও কালের বিচারে তাদের তৎকালীন ইয়োরোপীয় শিল্প আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করলে তাকে অসংগত মনে করে চোখ কপালে তোলার কোনো কারণ ঘটে না।

তবু এই রচনাটি যথেষ্ট উত্তেজনার জন্ম দিয়েছিল। ধুম উদ্‌গীরণও, ফলে, কম হয়নি। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় যাঁরা সরব হন, তাঁদের অনেকেই বিদগ্ধ জন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের পরও চিন্তায় পরমুখাপেক্ষিতা কারো কারো কাছে অরুচিকর মনে হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে যেখানে তাঁর অধিষ্ঠান পূজার বেদিতে, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'-বলে যেখানে চলছে তাঁর স্মরণ-মনন, সেখানে তাঁকে ইয়োরোপীয় ভাবনার অনুগত ও কৃতার্থ প্রজা হিসাবে দেখানোয় ক্রুদ্ধও হন কেউ কেউ। বিশিষ্ট জনেরা, যেমন, দিলীপ কুমার রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, শান্তিকুমার মিত্র, মতামত জানতে চান অন্নদাশঙ্কর রায়ের; নিরাসক্ত বিচারে তিনি তাপ প্রশমন করবেন, এই আশায়।

অন্নদাশঙ্কর খোলা মনে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান। বুদ্ধদেব যে বলেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোমান্টিক, এতে তিনি দ্বিমত করেন নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা কবুল করেছেন। কিন্তু এই কারণেই তিনি ইয়োরোপীয় — কারণ রোমান্টিকতা ইয়োরোপেরই সামান্য লক্ষণ — এটা অন্নদাশঙ্কর মানতে পারেননি। রোমান্টিকতা ছিল ইয়োরোপের ভাবনা জগতে খণ্ডকালের প্রবলতর যুগধর্ম। সামগ্রিকভাবে তাকে ইয়োরোপে সর্বকালের-সর্বসাধারণের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যায় না। তিনি আরো বলেন, রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীয় ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের কবিপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত কবি। যদিও প্রকৃতিগতভাবে ও যুগধর্মের টানে শেলী কীট্স ওয়ার্ডসওয়ার্থ টেনিসন বাউনিং-এর সমানধর্মা।' (অন্নদাশঙ্কর, ১৯৬২ : ১৩৭) তারপরেও তিনি যে ইয়োরোপীয় ভাবধারার কবি, এটা খোদ ইয়োরোপীয়রাই চিনতে পারেননি। প্রাচ্যের কবি-মনীষী, এই ভাবরূপেই তিনি তাদের কাছে সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন। এর ফলে বিশ্বসাহিত্যে তিনি ঠাঁই করে নিয়েছেন, কিন্তু ইয়োরোপীয় সাহিত্যে তাঁর স্থান হয়নি।

অন্নদাশঙ্কর এর সঙ্গে যোগ করেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল পূর্বপশ্চিমের সেতুবন্ধন। তিনি অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পরস্পর মিলিত হবে, এইটেই আধুনিক যুগের কৃত্য। এই মিলনে যাঁরা বাধা দেবেন তাঁরা দেশভক্ত হলেও ভ্রান্ত। এই জন্যে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গেও একমত হতে পারেন নি।' (অন্নদাশঙ্কর, ১৯৬২ : ১৪১)[২]

বুদ্ধদেবের স্বাধীন মতকে তাই বলে তিনি পুরোপুরি খারিজ করে দেন না। অশ্রদ্ধাও করেন না। ইয়োরোপীয় ভাবনা-জগতের জলহাওয়া যে রবীন্দ্রচিত্তের পুষ্টি জুগিয়েছিল, এ তিনিও মিশিয়ে নেন। যদিও সেইটিই সব নয়। এবং অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন না। তিনি যে ভারতীয় ক্লাসিক ঐতিহ্যের একটি ধারাকেও অনুসরণ করে চলেন, এটা কেবল জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তার চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়ে নয়। তাঁর অন্তরের শ্রেয়বোধ তাঁকে চালিত করেছে। এ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য তাতে ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয় না।

অন্নদাশঙ্করের বিজ্ঞ বিবেচনায় বিষয়টির সাময়িক নিষ্পত্তির ইঙ্গিত মেলে। তবে প্রশ্নটি, মনে হয়, আরো ব্যাপক। শুধুই সাহিত্য-শিল্পকলার খণ্ড-খণ্ড নিদর্শন থেকে অথবা কালচিহ্নিত ধ্যান-ধারণার প্রবলতা থেকে এর সমাধান-সূত্র সবটা হাতে আসে কি না তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। আমরা তাই আর একবার কাললক্ষণগুলো বোঝার চেষ্টায় তাদের মুখোমুখি হই। কালের প্রেক্ষাপটটাও একই সঙ্গে সামনে চলে আসে। প্রাচ্য-প্রতীচ্য, এই রকম ভূ-বিভাগ কতটা যুক্তিসম্মত, আর কতটা কল্পনাপ্রসূত বা ঘটনাবাহিত, তা-ও খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য চিন্তার কেন্দ্রভূমিতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। তাকে অবলম্বন করেই স্থান ও কালের যোগসূত্র কীভাবে কোথায় প্রকাশ পায়, অথবা ছিন্ন বা প্রতিহত হয়, তা খুঁজি। ভৌগোলিক বিভাজনের বা দূরত্বের কারণেই বিভিন্ন জনপদে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও তাদের জীবন ভাবনায় তফাত্ হয়ে যায় কি না, পরিণামে তাদের চিন্তায় ও কর্মসাধনায় অগ্রগতির হার একেক জায়গায় একেক রকম হয়ে তা বহু বিচিত্র রূপ

পায় কি না, তা বোঝার চেষ্টাও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের মতো করে সেদিকে এবার নজর দিই।

তিন

বুদ্ধদেব বসুর আক্ষেপ, রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় ভাবধারা রপ্ত করেও সাহিত্য-সাধনায় তার বিকাশের পথরেখা সমান তালে অনুসরণ করেননি। রোমান্টিকতা তাঁকে পেয়ে বসে। কবিতায় তার রমণীয় মায়াজাল তিনি ছড়িয়েছেন। এবং তা আজীবন। এই রোমান্টিক ভাবতরঙ্গ কিন্তু ইয়োরোপে বিপুল উচ্ছ্বাসে দুকূল প্লাবিত করে একসময় থিতিয়ে আসে ওই উনিশ শতকের প্রথমভাগের সীমানাতেই। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মান, তখন তার পড়ন্ত দশা। তাঁর কবিতায় জোয়ার আসে উনিশ শতকের শেষ পর্বে। তাতে ভাটার টান দেখা দেয় না কখনও। আর তাঁর রোমান্টিক মেজাজ এই দীর্ঘ সময় অক্ষুণ্ণই থাকে। অন্য ভাব, অন্য অস্থিরতা যোগ হয় ঠিকই; কিন্তু মূলে রোমান্টিক মানসে তেমন তারতম্য ঘটে না। এদিকে চলমান জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ইয়োরোপের চিন্তাকাশে নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়ে চলে। ভাবকল্পনায় অসুন্দর-ও-অমঙ্গলের ছায়া প্রবলতর ও গাঢ়তর হয়ে উঠতে থাকে। বিশ শতকে ইয়োরোপীয় কবিতার এই তাগিদ রবীন্দ্রনাথে তেমন দাগ কাটে না। তিনি তাঁর পূর্বলব্ধ শ্রেয়-ভাবনায় অবিচল থাকেন। অথবা তাঁর প্রাচ্য-ঋষির ভাবমূর্তি চিন্তার ওই ছকে তাঁকে বেঁধে রাখে। তারপরেও তাঁর শিল্পীসত্তা সাড়া না দিয়ে পারে না। কবিতায় না হলেও শেষ বয়সে তাঁর আত্মপ্রকাশের আর এক মাধ্যম চিত্রকলায় তা ধরা পড়ে। অবশেষে ইয়োরোপীয় সমকালীনতাকে তিনি ছুঁতে পারেন। তাঁর বন্দিদশা ঘোচে। যেমন ঘুচেছিল প্রথম যৌবনে রোমান্টিকতার আবাহনে।

সরাসরি বলা না হলেও বুদ্ধদেবের বক্তব্য থেকে, মনে হয়, এই ধারণা প্রশ্রয় পায়, — অন্তত তেমন ভাবা অসমীচীন নয় — যে, সব সময় সব অবস্থায় ইয়োরোপীয় চিন্তা-ভাবনার অনুসরণই আমাদের মোক্ষলাভের উপায়। তা থেকে যদি বিরত থাকি, তবে স্থবিরতা বিপুল গৌরবে জাঁকিয়ে বসে। কূপমণ্ডুকতার মহিমা আত্মতৃপ্তি জাগায়। সৃষ্টিশীলতার মহাসড়ক থেকে আমরা ছিটকে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের মতো অতুল প্রতিভাকেও এমন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। এর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতেই তাঁর জীবনের অনেকখানি কেটে যায়। সম্ভাবনার সবটুকু তাঁর বিকশিত হয় না। তাঁর চিত্তের মুক্তরূপ আমরা সব সময় দেখি না। এ বক্তব্যে সারবস্তু যে একেবারে কিছু নেই, তা হয়ত নয়। কিন্তু তা যে অতি প্রকটভাবে আংশিক ও অপরিণত চিন্তাসূত্রে লোভনীয়ভাবে সরলরৈখিক হয়ে পড়ার আশঙ্কা জাগাতে পারে একথা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এদিকেও তাই আমাদের নজর দিতে হবে।

আমরা প্রথমে রোমান্টিকতার বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। আঠারো-শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় ইয়োরোপে রোমান্টিক ভাব-আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। ঢেউ তার আছড়ে পড়েছিল আমেরিকাতেও। প্রথম ধাক্কায় এডগার অ্যালান পো, ও কিছু পরে, ওয়াল্ট্ হুইটম্যান কবিতায় রোমান্টিক কল্পনার অবাধ মুক্তির ছবি আঁকেন।[৩] চেতনার পরতে পরতে স্বপ্ন ও বাস্তবের উত্তাল মেশামেশিতে উল্লাস ও আতঙ্ক,

শৈত্য ও শিহরন, মুগ্ধতা ও বিমুখতা, বিপুল আশা ও গভীর হতাশা, — এ সবই ছাড়া পেয়ে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো প্রবল তোড়ে বেরিয়ে আসে। কারণ-অকারণের পূর্বনির্ধারিত সীমারেখা মুছে যেতে বসে। হৃদয়ের কথা — ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকৃত-একান্ত-গোপন ব্যাকুলতা ভাষা খোঁজে। ইয়োরোপ-আমেরিকায় শিল্প-সাহিত্য আর পুরনো ঘাটে বাঁধা থাকতে চায় না। যুক্তি-পরম্পরার অনুমোদিত ছক, অথবা, ঘটনার বিধিসম্মত বিন্যাস, প্রত্যেকে তার কৌলীন্য হারায়। রোমান্টিক আকুতি ও রোমান্টিক উন্মত্ততা অনিশ্চিত বাস্তবতায় ব্যক্তির উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষার সত্যস্বরূপের কল্পনাগ্রাহ্য আকারে প্রকাশ পেতে চায়। শিল্প-সাহিত্যের ঘট-পট বিষয়-আশয় সবই ভেতর থেকে বদলে যায়। এবং স্থায়ী হয়। জীবনকে তা পাশ কাটিয়ে যায় না। বরং ব্যাপক গণজীবনে মৌলিক ও অসংশোধনীয় পরিবর্তনের অভিঘাত তাতে নির্ভুলভাবে ফুটে ওঠে। সেইটিই চলে আসে নিয়ন্তার ভূমিকায়।

রোমান্টিক কবিতার কথা উঠলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে ইংরেজ কবি শেলী, কীট্‌স্, বায়রন, ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, এঁদের নাম। ব্লেক, কোলরিজ, এঁরাও রোমান্টিক। এঁদের কথা যে প্রথমে মনে আসে, তার কারণ সম্ভবত ইংরেজির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের দীর্ঘদিনের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসনে উনিশ শতকের তিরিশের দশকেই এদেশে সাধারণভাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পায় ইংরেজি। তার আগেও কলকাতায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজিতে পারদর্শী হয়ে উঠতে শুরু করেন। ইয়োরোপকে তাঁরা জানেন প্রধানত ইংরেজি ভাষার সূত্রে। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তেমন ঘটে না। ইংরেজি অনুবাদে যা মেলে, তাই।[৪] কিছু পরে রবীন্দ্রনাথেরও ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় যে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় ছিল, এমন কোনো ধারণা আমরা পাই না। অবশ্য ইংরেজির মাধ্যমে ওয়াকিবহাল থাকায় কোনো অসুবিধা ছিল না। মোটামুটি সেই ধারাই এখনও বহমান। এত কথা বলার কারণ, আমরা খুব একটা খেয়াল করি না, ওই সময়ে রোমান্টিকতার হাওয়া বয়ে যায় গোটা ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর দিয়েই। জর্মন গ্যেটে বা ফরাসি ভিক্টর হুগো কিংবা ব্যালজাক এর ঝাপটা এড়াতে পারেন না। এড়াতে চানও না। শুধু সাহিত্যে নয়, রোমান্টিকতা ছাপ ফেলে সঙ্গীত ও চিত্রকলাতেও। সঙ্গীতে মোৎসার্ট থেকে হ্বগনার, বিঠোফেন, চিত্রকলায় টার্নার, কন্‌স্টেব্‌ল, দেলাক্রোয়া, এবং অনিবার্যভাবে গোয়া, এঁরা সবাই রোমান্টিক প্যাশন উগড়ে দেন তাঁদের সৃষ্টি-সাধনায়।[৫]

ভুল হবে, যদি ভাবি, রোমান্টিক প্রতিভা সবাই একই কথা ভেবেছেন, ঝুঁকেছেনও সবাই একই দিকে, একই আদর্শ কল্পনা মাথায় রেখে। তবে মধ্যপন্থী তাঁরা কেউ নন। এবং সবাই তাঁরা অস্থির। ডাইনে কিংবা বামে তাঁদের অবস্থান। দিক-বদলও ঘটে কারো কারো। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকেন না কেউই। বায়রন ও শেলীও ছিলেন কিংবদন্তি। রাশিয়ায় ডস্টোইয়েভ্‌স্কিও তাই। যে ভাবমূর্তি তাঁদের তৈরি হয়, তা কোনো ধ্যানী মৌনী তপস্বীর নয়। বেশির ভাগই তাঁরা বেপরোয়া। জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত। কখনও বা এলোমেলো, এমনকি বিপর্যস্ত। সংরাগের তীব্র ঝলকানিতে তাঁরা উদ্ভাসিত। তাঁদের সৃষ্টিতেও সঞ্চারিত হয় তার আবেগ।

এটা মনে করা ঠিক হবে না, ইয়োরোপের মাটিতে এমন কোনো মন্ত্রবারি ছিটানো আছে যার যাদুকরী প্রভাবে সেখানে রোমান্টিক সৃষ্টিকাণ্ডের অত্যাশ্চর্য স্ফুরণ ঘটে এমন কি তার আগে-পরেও ওই প্রভাবের কারণেই ওই অঞ্চলের মানবশক্তির মেধা ও ভাবনা-কল্পনা গোটা পৃথিবীর শিক্ষা-সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে পথ দেখিয়ে চলে। বাস্তব ঘটনার কার্যকারণরাশি এমনভাবে পরস্পর অন্বিত হয়, যাতে এক কালখণ্ডে ইয়োরোপই সমগ্র বিশ্বের চিন্তা ও কর্মের সূতিকাগার হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অন্য কিছুর দোহাই দিতে হয় না। ইয়োরোপের সব মানুষই যে ওই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার, তাও নয়। এবং অসামান্য অর্জনের সঙ্গে অপূরণীয় ক্ষতিও যে একই উৎস থেকে উঠে আসে, এটাও আমাদের খেয়াল করতে হয়। উৎসমুখ খুলে যায় দুই প্রবল তাণ্ডবে। এক, ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লব, এবং দুই, আঠারো শতকের শেষভাগে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লব, যার প্রধান ক্ষেত্র ছিল ইংল্যান্ড, যদিও ইয়োরোপের আরো উদ্যোগী অঞ্চলেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। দুই ঘটনাই মানুষের জীবনভাবনার ও জীবনযাপনের অভ্যাসশাসিত নিয়মনীতির শিকড় ধরে নাড়া দেয়। ফল হয় তাদের মর্মভেদী, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তাই বলে তারা যে পুরোপুরি অকল্পনীয় ও আকস্মিক ছিল, এমন নয়। বহুশতাব্দী জুড়ে ইয়োরোপে বস্তুজগৎ ও ধ্যানের জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় বিভিন্ন মানুষের বহুমুখী বিক্ষিপ্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের অনির্ধারিত, কিন্তু অনিবার্য পরিণাম-ফলের যে সম্ভাবনারাশি, তা থেকে দুই বাস্তব উদ্গিরণ, শিল্প বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লব। কালবাহিত এই যোগসূত্রটাও আমাদের হিসাবে নিতে হবে। তবে তার আগে আঠারো শতকের শেষে ওই দুই বিপ্লবের স্বরূপ বোঝার একটু চেষ্টা করি। তাদের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইয়োরোপে। ঢেউ তাদের আঘাত হেনেছিল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। মানুষের ইতিহাস নতুন পথে বাঁক নেয়। এটা যে সবার জন্যে সুখের ছিল, সবার জন্যে পরিতৃপ্তির, তা কিন্তু নয়। করুণাহীন অনিশ্চয়তা ও অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ভেঙে পড়ে অনেকের মাথায়। তা ইয়োরোপেও। অথচ একই সঙ্গে থাকে মুক্ত জীবনের ও অমিত সম্ভাবনার হাতছানি। সুধা-বিষে মেশা এই তরল আসব জীবনপাত্রে উছলে ওঠে। পছন্দের বলে নয়, মানুষ অসহায় ও নিরুপায় বলে। তারপরেও তার মোহজাল চেতনায় ছড়ায়। আকর্ষণ তার কাঁচপোকার মতো টানে। সর্বনাশও মনোহর মনে হয়। রোমান্টিক মানস এ সবই নিজের করে নেয়। ক্রিয়ায়-প্রতিক্রিয়ায় প্রবল উচ্ছ্বাসে তা সাড়া দেয়।

ফরাসি বিপ্লব ছিল এক ধাক্কায় প্রাচীনের খোলস ভেঙে আধুনিকতায় পা রাখা। ধর্মতন্ত্রের অধিকার ও তার প্রতিনিধি হিসেবে রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব, দুই-ই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ইহজাগতিক ও অধিজাগতিক ক্ষমতার একক ও পূর্ণাঙ্গ কাঠামো বলে কোনো প্রতিষ্ঠান আর টিকিয়ে রাখা যায় না। মানুষ নিজেই নিজেকে তার ভাগ্যের নিয়ন্তা বলে ঘোষণা করে। মানবাধিকারসূত্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়, সব মানুষই জন্মে স্বাধীন। প্রত্যেকের তাদের সমান অধিকার; এবং তা আজীবন নিরঙ্কুশ। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বিপ্লবের পাদপীঠ থেকে উচ্চারিত হয়ে ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[৬] মানুষের মহৎ উত্তরাধিকারে তা অনুপ্রাণিত করে যারা মুক্তবুদ্ধির অনুসারী হতে চায়, তাদের সবাইকে। চেতনার রুদ্ধ কপাট যেন হঠাৎ করে খুলে যায়। 'জগৎ আসি সেথা

করিছে কোলাকুলি'[৭] — শুধু কথার কথা থাকে না। রোমান্টিক ভাবকল্পনার মূলে তা বাসা বাঁধে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কর্ষণায় ইয়োরোপে তা প্রাণবান হয়ে আলোয়-আলোয় চারদিকে ভরে তুলতে থাকে।

কিন্তু এ ছিল ফরাসি-বিপ্লবের মানুষকে জাগিয়ে তোলার দিক। আত্মবিশ্বাসে তাকে উদ্বুদ্ধ করার, তার সুপ্ত সম্ভাবনার সব পথ অনর্গল করে তাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ জোগাবার দিক। তবে চাঁদের যেমন উলটো পিঠে অন্ধকার, ফরাসি বিপ্লবেরও তেমন ছিল আর এক মুখ, তা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের শিকলে গাঁথা বাস্তবেরই আর এক জান্তব বহিঃপ্রকাশ। ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয় সফল বিপ্লব উদ্‌যাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ব্যক্তিগত আবেগ কখনোই প্রাতিষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতার ও নিরপেক্ষতার বিকল্প নয় এবং ব্যক্তির নিরঙ্কুশ আত্মবিকাশের অধিকার ব্যক্তিস্বার্থের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রকে প্রকট করে তোলে। আদর্শ কল্পনার পেছনে বাস্তব — এই বিরোধগুলো এবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাদের নিয়ন্ত্রণের সুশৃংখল ব্যবস্থা কিছু গড়ে ওঠে না। মারামারি-কাটাকাটি সর্বব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। বিপ্লব গণসমর্থন হারাতে থাকে। গণতন্ত্র রসাতলে যেতে বসে। আবির্ভাব ঘটে এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়নের। ধর্ম-সংগঠনের আশীর্বাদ ছাড়াই ব্যক্তি মানুষ যে কত ক্ষমতা ধরতে পারে তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে ওঠেন তিনি। আবার এই ব্যক্তির লাগামছাড়া ক্ষমতা সাধারণ মানুষের অসহায়তাও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। বিপুল মানবিক আশার বিপরীতে সীমাহীন হতাশার সংক্রমণ ঘটে। বিপ্লবই তা ঘটায়। রোমান্টিক ভাবনাকল্পনার স্থাপত্যে তার মসিকৃষ্ণ ছায়াপাত গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠতে থাকে।

ফরাসি বিপ্লব যেমন প্রথাশাসিত চিন্তার অভ্যস্ততা থেকে ভুক্তভোগী মানুষের সংবেদনশীল মনকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে — সবই তা সুখের নয়, এবং আকস্মিকতায় ও অনিশ্চয়তায় তা ছত্রখান — শিল্পবিপ্লবও তেমনি তার কাজের চেহারা আমূল বদলে দিতে শুরু করে। শিল্পবিপ্লবে নীতিগতভাবে কর্মনিয়োগের পন্থা-পদ্ধতি ও ফরাসি-বিপ্লবে মানবমুক্তির সংকল্প ঘোষণা যেন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দেখা দিতে চায়। ভূস্বামীর খামারে শ্রম আজীবন বাঁধা থাকবে, এটা আর অপরিহার্য থাকে না। কলকারখানায় দরাদরিতে ঠিক হবার কথা শ্রমের মজুরি। বাজারের স্বয়ংক্রিয়ার ওপরেই নির্ভর করবে এখানে সবকিছু। ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে কেউ প্রভু, কেউ দাস, যেমন নাকি ঈশ্বর ও মর্ত-মানুষের কল্পনায়, তা আর নৈতিক অনুমোদন পায় না। সর্বাত্মক তত্ত্বভূমি রচনা করেন অ্যাডাম স্মিথ। তাঁর *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে। ঈশ্বর নয়, একক কোনো ব্যক্তি নয়, তিনি দেখান, প্রত্যেক মানুষের আপন আপন স্বার্থের তাগিদে সবার কেনাকাটায় বাজার নৈর্ব্যক্তিকভাবে সব কিছুর দাম ঠিক করে দেয়। শ্রম, অতএব, কেবল বাজারকেই মান্য করবে, যেমন মান্য করবে তার ক্রেতা। অধিকারের সমতা নির্ধারণ করে বাজার। সেই অনুপাতে শ্রম আত্মনির্ভর হয়। আর বন্ধনদশা ঘোচে।

অবশ্যই এসব ধারণা আকাশ থেকে পড়ে না। প্রযুক্তিতে আশ্চর্য বিকাশ ও বৈচিত্র্য উৎপাদনে সামর্থ্য বাড়ায়। তাতে গতি আনে। বড় বড় কারখানা গজিয়ে ওঠে। স্টীম

ইনজিন ও রেল ইনজিনের আবিষ্কার পরিবহন ও বিপণনের চাহিদা মেটাবার পথ খুলে দেয় উনিশ শতকের গোড়াতেই। যোগাযোগ দ্রুত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দূর-দূরান্তে প্রসারিত হয়। শ্রম-চাহিদা বিভিন্ন কাজে বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বাজার তার কাজের দাম মিটিয়ে দেয়। সে নিজেও তার কর্মকুশলতা যেখানে খুশি বেচতে পারে।

সন্দেহ নেই, শিল্পবিপ্লব একদিকে যেমন গণমানুষের সক্ষমতা বাড়াবার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে, অন্যদিকে তেমনি তাদের করা এবং হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রেরও প্রসার ঘটায়। চেতনার নতুন নতুন দিগন্ত তাদের উন্মোচিত হতে থাকে। জীবন তাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল হয়। এর ছাপ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই সে-সময়ের রোমান্টিক ভাবনায়। বিপুল আশাবাদ ও জীবনতৃষ্ণা, প্রতিকূলতাকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা, এমন কি ধ্বংস অনিবার্য জেনেও মাথা নত না করা, এই আকুলতাগুলো রোমান্টিক সাহিত্যে ও শিল্পকলায় বার বার দেখা দেয়। আরো দেখা দেয়, যা করার নয়, যা ভাবার নয়, তার সম্মোহন। জীবনের চারপাশ দমকা হাওয়ায় যেন খুলে যায়। মানুষ তার চিন্তাকে যেদিকে খুশি চালিত করে। সবকিছুই বুঝি তার পক্ষে সম্ভব। গ্যেটের ফাউস্ট, বায়রনের ডন্‌জুয়ান নতুন আঙ্গিকে নতুন তাড়নায় মানুষের ভাবনার জগতে হানা দেয়। ফরাসি চিত্রকর ডেভিড ও দেলাক্রেয়া তাদের আঁকা ছবিতে মানুষী কল্পনার সীমাতেই অমিত শক্তির স্বপ্ন জাগান। (Hobsbawn, 1984 : 16, 17, 24)

কিন্তু শিল্পবিপ্লবেরও ছিল কদর্য-কুৎসিত মুখবিকার। খোলা বাজারের স্বাধীনতা সবার সমান হয় না। পুঁজির কর্তৃত্ব দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় বাজারের অধিকারী। ভূস্বামীর জবরদখল থেকে শ্রম অনেকটা বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার অসহায়ত্ব ঘোচে না। কারখানা-মালিকের মুনাফার তাগিদ শ্রমের শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়ও দ্রুততর হয়। চারদিকে নোংরা পরিবেশে শ্রমজীবী মানুষ জন্তু-জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে আসে। প্রাচীন অভিজাত শ্রেণি নয়, সহায়-সম্বলহীন শ্রমিক শ্রেণিও নয়, কলকারখানার মালিক ধনিক-বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণি ('মধ্যবিত্ত' নয়, 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়। মধ্যশ্রেণি মধ্যবিত্ত নয়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তারাই সবচেয়ে সম্পদশালী ও সক্ষম) আর্থসামাজিক নেতৃত্বে চলে আসে। মানবিক মূল্যবোধহীন নির্বিবেক নিষ্ঠুরতায় তারা নতুন মাত্রা যোগ করে। অনেকের মোহভঙ্গ হয়। বিশেষ করে যাঁরা বেশি অনুভূতিপ্রবণ, তাঁদের। কেউ কেউ হয়ে পড়েন অতীতমুখী। প্রকৃতির শুশ্রূষায় নিরাময় খোঁজেন পরাভূত যন্ত্রণাদগ্ধ কক্ষচ্যুত মানুষেরা। রোমান্টিক আর্তিতে তাঁদের আকুতিও এসে মিশে যায়। যেমন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের। তবে এইটিই শেষকথা নয়। কিছু পরে রোমান্টিক অতৃপ্তির জায়গা দখল করে সমাজ পরিবর্তনের শীতল যুক্তিনির্ভর মতবাদ। তার তত্ত্বভূমি রচনা করেন কার্ল মার্কস্। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এঁকে দেয় ইতিহাস বিচারে তাঁর যুক্তির ক্রমপর্যায়। বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার অবসানের নিদান তিনি হাঁকেন। মার্কস্ রোমান্টিক ছিলেন না। রোমান্টিক কালপর্ব পেরিয়ে তাঁর আবির্ভাব। তবে রোমান্টিক চিত্তভূমিতেই তাঁর উত্থান। রবীন্দ্রনাথ মার্কস্ সম্পর্কে উৎসাহহীন ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর তরুণ বয়সে, এমনটি সম্ভবত সত্য নয়। ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যেরই তিনি অনুরাগী ছিলেন। তবে তার কতটা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেটিই দেখবার।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইয়োরোপে সামাজিক অস্থিরতা কমে আসে। বিশেষ করে ব্রিটিশ ভূখণ্ডে। বুর্জোয়া আধিপত্য অনেকটাই তখন প্রশ্নাতীত বাস্তব। এ নিয়ে উত্তেজনাও স্তিমিত। সমৃদ্ধির স্থিতিশীল ঊর্ধ্বরেখার দিকেই নজর সবার। তাই ব্রিটিশ বুর্জোয়া মূল্যবোধে শৃংখলা-নিয়মানুবর্তিতা, শালীনতা ও কেতাদুরস্ততা, এগুলোই জমিয়ে বসতে থাকে। সাহিত্যে ও শিল্পে তা ফুটে ওঠে। সাম্রাজ্যের সফল বিস্তারও মেজাজে এক ধরনের অহংকার ও গাম্ভীর্য আনে। সব মিলিয়ে রোমান্টিক বিদ্রোহ ও উচ্ছ্বাস প্রবণতা থিতিয়ে আসে। এদের প্রভাব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওপরেও পড়ে। রোমান্টিক ভাবমাধুর্য তিনি ফুটিয়ে তোলেন; কিন্তু সংযম ও সুরুচির আবরণ তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় সাহিত্যের উত্তরাধিকারসূত্রে এটা তাঁর অর্জন নয়। ওই সাহিত্যের ধারায় রুচিবাগিশ হওয়া আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বুদ্ধদেব বসু এদিকে খেয়াল করলে দেখতে পেতেন রবীন্দ্রনাথের যৌবনে ইংরেজি সাহিত্যের স্তিমিত স্রোত তাঁকেও পরোক্ষে সংযত করেছে। ফরাসি সাহিত্যে কিন্তু প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান তখন নতুন করে জোরালো হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাঁর মনোযোগ তখন কতটুকু আকৃষ্ট হয়েছিল, বলা শক্ত। আরো পরে ইংরেজি কবিতারও পালাবদল ঘটে। সেটা *গীতাঞ্জলির* বিশ্বস্বীকৃতি পাবার পর। সচেতনভাবে সে হয়ে উঠতে চায় রোমান্টিকতা-বিরোধী, মলিন বাস্তবতা সংলগ্ন ও ঝাঁঝালো বিদ্রূপমুখর। বাস্তবের নগ্ন বিভীষিকা থেকে, রবীন্দ্রনাথ মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। তবে ইংরেজি আধুনিক কাব্যের মেজাজের সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পারেননি। এটা তাঁর অসচেতনতা নয়। বাস্তবের সঙ্গে দ্বৈরথে তিনিও নেমেছেন। এবং তা একান্তই তাঁর নিজের মতো করে।

ফরাসি-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব ইয়োরোপে মানুষের মনে যে বিপুল আশার সঞ্চার করেছিল, তাতে কোনো ভুল নেই। শুধু ইয়োরোপে নয়, যেখানে যেখানে তাদের বার্তা পৌঁছেছে, সব জায়গাতেই। বাংলায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন রামমোহন রায়। শিল্প স্থাপনায় উদ্যোগী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। অবশ্য তাঁদের উৎসাহের পালে বাতাস লাগে না। বস্তুগত অবস্থা এখানে তার অনুকূল ছিল না। এবং ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতায় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের দিকটাও নতুন যুগের ভাবুকদের হতোদ্যম করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দ্বারকানাথের কর্মতৎপরতার ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন বললে, বোধ হয়, কম বলা হয়। প্রচ্ছন্ন বিরাগই তিনি পোষণ করতেন। ইয়োরোপীয় রোমান্টিকতার পেছনে বাস্তব অভিজ্ঞতার যে প্রেক্ষাপট, তাকে তিনি নিজের করে নেবার কথা কখনো ভেবেছেন বলে মনে হয় না। সেখানে প্রত্যাশা যেমন আকাশচুম্বী হয়েছিল, তেমনি তার বিরাট অংশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তেও দেরি হয়নি। যদিও তার আকর্ষণ থেকে মুক্তিও মেলেনি। নৈরাজ্যের বিভীষিকা ঠেলে মানুষ এগিয়েছে। মারামারি-হানাহানিতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে নাগরিক জীবন। কল-কারখানায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষের বিরামহীন কাজ। তার ক্লেদ ও গ্লানি উপচে ওঠে প্রকাশ্যে। পুঁজির বাজারে অবিরাম ওঠা-গড়ার খেলা। লাভের হিসেবের তলে চাপা পড়ে যায় লোভোন্মত্ত জনগণের মানবিক মুখ। আবার তাতেই সচল হয় প্রবৃত্তির চাকা। আকাশে ওড়ে স্বপ্নের ফানুস। এই সময়ের চালচিত্র, এবং চলচ্চিত্র নিখুঁত ধরা পড়ে ডিকেন্‌স্ ও ব্যালজাকের উপন্যাসে।

এই মিশ্র অনুভব গড়ে তোলে রোমান্টিক নারী-প্রতিমাও। সুন্দরের স্বপ্নকল্পনা রচিত হয় তাকে ঘিরে। অবশ্য এটা অভিনব কিছু নয়। রেনেসাঁস চিত্রে ও ভাস্কর্যে তার উজ্জ্বলতম, পবিত্রতম প্রকাশ আগেই ঘটেছে। তবে রোমান্টিক মানস নারীতে দেখে আরো কিছু। শুধু সে মুগ্ধ করে না, ধ্বংসও করে। সার্থকতার পূর্ণতায় নয়, টানে কামনার অচরিতার্থতার উত্তুঙ্গ চূড়ায়। উজ্জীবনী-হ্লাদিনী তার প্রেরণা কিন্তু একই সঙ্গে কুহকী-মায়াবিনী সে। তার নিশ্বাসে মিশে থাকে সর্বনাশা বিষ। তবু তার আকর্ষণ অনিঃশেষ। চেতনাকে বিবশ করে এই নারী কীটস্-এর 'LaBelle Dame Saus Merci'-তে কোলরিজে-এর 'Christabel-এ, শেলীর 'Epipsychidion'-এ। গ্যেটে তাঁর ফাউস্ট-এ ট্রয়ের হেলেনকে আবার ফিরিয়ে আনেন।[৮] সুন্দরের মোহ বিনষ্টির জাল বিছায়। ফাউস্টের অতৃপ্তির 'বিরামবিহীন তৃষা' এভাবে তাঁকে শয়তানের ফাঁদে ফেলে। রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' অথবা 'মানসসুন্দরী'র নায়িকায় বুদ্ধদেব বসু এই রকম femme fatale-র রোমান্টিক ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেন। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায়, মৌলিক তফাত্ আছে দুই-এর ভেতরে। রবীন্দ্রনাথের সুন্দরী কোনো সর্বনাশের দূত হয়ে আসে না। বাংলার বাস্তবে তখনও তা বেমানান। কল্যাণ ও সুন্দরের সত্য-শাশ্বতরূপে তাঁর আস্থা ছিল অবিচল। ফলে তাঁর কবিতায় ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আবেগের দেখা পাওয়া গেলেও তার কারণভূমি একইরকম খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন তিনি বলেন, '... কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে' আর 'আকাশকুসুম করিনু হতাশে', তখন তাতে যে তাঁর সত্য কিন্তু অকারণ আক্ষেপই ফুটে ওঠে, এমনটাই যথার্থ মনে হয়। তবে শুধু রোমান্টিক ভাবনাবিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা বলা। তাঁর সৃষ্টির সার্বিকরূপ কোনো বিশেষ সময়ে, অথবা ধারাবাহিকভাবে সমস্তটা জুড়ে মোটেই তেমন নয়। অকল্যাণকে তিনি উপেক্ষা করেননি। পরিণত বয়সে তার সঙ্গে বোঝাপড়া তাঁর কল্পনাবিলাস মাত্র ছিল না। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ছিল মর্মান্তিকভাবে বাস্তব। তবে তখন তাঁর কবিতা উনিশ শতকী রোমান্টিক নয়, বিশ শতকের ইয়োরোপে রোমান্টিক ভাবনার বিপরীত যে অবস্থান তাও নয়। আন্তরিকভাবে তা একান্তই রাবীন্দ্রিক, এবং রাবীন্দ্রিক হবার কারণেই নির্বিশেষভাবে প্রসারিত দৃষ্টিতে বৈশ্বিক। 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে', 'মুক্ত করো হে বন্ধ' — এই প্রার্থনার পরিণামফল তা। আবু সয়ীদ আইয়ুবের *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*-এ তাঁর শেষপর্বের কবিতার আলোচনায় তার যথার্থ পরিচয় অনেকটাই আমরা পাই। (আইয়ুব, ১৯৯৫ : ৯১-১২৫)। 'মারের সাগর পাড়ি' দেন তিনি। 'দুঃখ দিনের রক্তকমল' তিনি তুলে আনবেন, এই তাঁর পণ।[৯] এ কোনো ভান নয় দুঃখ-বিলাসও নয়। সমকালীন ইয়োরোপের অনুগামী তো নয়-ই। এতে তিনি পিছিয়ে পড়েন না। বরং নিজেকে আরো প্রাসঙ্গিক, আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন।

অতএব, এটা মানতেই হয়, তাঁর রোমান্টিক ভাবনারাশি অন্তর্জাত নয়। অনেকটাই তার হাওয়ায়-হাওয়ায় দূর থেকে ভেসে আসে। তাদের বস্তুভূমির বিচিত্র আয়োজনে মন্থনে উঠে আসা আঁচ ও অতৃপ্তি, অস্থিরতা ও অবিশ্বাস মনকে মজায়। এই স্বপ্নবিলাস দেশ-কাল নিরপেক্ষ; যদিও উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আমেজ তাতে বাড়তি মায়া জুড়ে দেয়। তিনি নিজেও সম্ভবত রোমান্টিক হওয়া বলতে এমনটিই বুঝে থাকবেন। তা নইলে

জীবনের অন্তিমলগ্নে যখন কবুল করেন, 'আমি জন্ম-রোমান্টিক', তখন কেন 'বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়' তাঁর কণ্ঠে আক্ষেপের সুর বাজে, কেন 'অনসূয়া'-র কল্পপ্রতিমা ক্ষণিকের জন্যে হলেও তাঁকে এক 'রোম্যান্টিক' আবেশে ডুবিয়ে রাখে, — আর তিনি সাফাই গান, 'এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা/মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।/আকাশকুসুম কুঞ্জবনে, /দিগঙ্গনে/ভিত্তিহীন যে বাসা আমার/সেখানেই পলাতকা, আসা-যাওয়া করে বার-বার।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪ : ৭৩১)। আমরা দেখি, তাঁর 'রোম্যান্টিকতা'র বাসা যে 'ভিত্তিহীন' একথা তিনিই আমাদের মনে করিয়ে দেন। তা মনোরম অবশ্যই। সত্য-অনুভবের আভাও তাতে ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু জীবনের রোখ তাতে ফেটে পড়ে না। মানুষের হয়ে ওঠার 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' সেখান থেকে দেখা যায় না। আমাদের সৌভাগ্য এই 'বাসা'-য় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন বাস করেননি। তবে অস্বীকার করি না, এই বাসায় যখন খুশি যাওয়া আসা তাঁর চেতনাকে প্রসারিত করেছে। তাকে সমৃদ্ধও করেছে। এবং তা এই আংশিক রোমান্টিকতার অন্তর্জাত দুর্বলতা সত্ত্বেও। পাশ্চাত্যে উনিশ শতকের রোমান্টিক আন্দোলন কিন্তু ছিল মানব-সমুদয়ের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জায় জন্ম নিয়ে চেতনায় নিষ্কাশিত গরল ও অমৃতের একীভূত বিস্ফোরণ। একে অহেতুক কল্পনা-বিলাস বলা যায় না। এবং এর পেছনে ছিল বহু শতাব্দী ধরে মানুষের হতে থাকার — হয়ে ওঠার ইতিহাস। তাতে গৌরব যেমন আছে, লজ্জা ও অপমানও আছে। 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' পেরিয়েই তাকে এগোতে হয়েছে। আমরা অনেকে ইয়োরোপের অর্জনকে সর্বজনীন, সর্বাঙ্গীণ ও বাধা-বন্ধনহীন মনে করে তাতে মহত্ত্ব আরোপ করি। তা সর্বাংশে সত্য নয়।

আধুনিক ইয়োরোপের উত্থান ঘটেছে বলা যেতে পারে, মোটামুটি গত পাঁচ-ছ'শ বছরের ভেতরে। চিন্তার ক্ষেত্রে মনের মুক্তির শুরু রেনেসাঁসে। ষোড়শ শতকে সৃষ্টিশীল প্রোটেস্টান্ট ধর্ম বিপ্লব, ঈশ্বর ও ব্যক্তির ভেতরে পাদ্রি-পুরোহিতদের মধ্যস্থতা অস্বীকার করে যাজকতন্ত্রের হাত থেকে মানুষের বেরিয়ে আসার পথ দেখায়। পাশাপাশি নতুন বিধান উদ্যোগপতিদেরও উৎসাহ জোগায়।[১০] গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) ও নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭) বিজ্ঞান ভাবনার প্রেক্ষাপট আমূল বদলে দেন। রেনেসাঁসের প্রেরণায় শিল্প-সাহিত্য প্রবলভাবে মানবিক হয়ে ওঠে। শেক্সপীয়ারের আবির্ভাব ঘটে (১৫৬৮) এই কালখণ্ডেই। পাশাপাশি উৎসাহ পেতে থাকে সামুদ্রিক অভিযান। নতুন নতুন দেশ-মহাদেশের ঠিকানা মেলে। চিন্তায় ও কাজে অতিপ্রাকৃত বাধা আর অনড় থাকে না। নানা ঘাত-প্রতিঘাত বাদ-প্রতিবাদ পেরিয়ে এসবের মিলিত ধারার পরিণতি হয়ে দেখা দেয় ফরাসি বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব। ইয়োরোপের স্বাভাবিক কোনো শ্রেষ্ঠত্ব অথবা কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তেমন থাকলে পনের শতকের আগেও তা ধরা পড়ত।

আরো একটা ভ্রান্তি আমরা বয়ে বেড়াই, তা হলো, ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠত্ব মানে সব ইয়োরোপবাসীরই অন্যদের তুলনায় বিদ্যা-বুদ্ধি যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব। সাধারণভাবে এই দুই-এর ভেতরে সম্পর্ক ক্ষীণ। কার্যকারণের যোগাযোগে সৃষ্টিশীল উদ্যোগের অনুকূল অবস্থা একটা ইয়োরোপে তখন তৈরি হয়। তা কাজে লাগাবার ফলে যেখানে যার যেমন উন্নতি। সবাই তাতে শামিল হতে পারে না। একবার হতে পারলে ফল যে চিরস্থায়ী, এমনও না। নিকট অতীতেও ইয়োরোপের অনেক অঞ্চল এই উপমহাদেশের মতো, অথবা তার চেয়েও

বেশি দারিদ্র্যপীড়িত ছিল। বিশ শতকের গোড়ায় আয়ারল্যান্ড ছিল আমাদের চেয়েও বেশি বুভুক্ষু। নতুন মহাদেশে অভিবাসন স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি, এই সব দেশের মানুষকে বেকারত্ব ও অনাহার থেকে রক্ষা করে। আকবরের আমলে ভারতবর্ষ এলিজাবেথের ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ছিল। একটা সমীক্ষায় পাওয়া যায়, ফরাসি বিপ্লবের কালে ওই অঞ্চলে পুরুষ জনগণের গড় উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ২ ইঞ্চিরও কম। (Hobsbawm, 1984 : 21)। সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা দশ-বারো। আসলে প্রকৃতিগতভাবে আমরা দুর্বল, এবং চিন্তায় ও কাজে পাশ্চাত্যের অনুকরণেই আমাদের সমূহ মঙ্গল, এই হীনমন্যতার সর্বতোভাবে প্রয়োগসাধ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা বেশ মুশকিলই। বিশেষ বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে পরিবর্তনের তাগিদ এই কালপর্বে ইয়োরোপে চেপে রাখা যায়নি। বাস্তব অবস্থার চাপ ওই পরিবর্তনের সহায় হয়েছে। আমাদের ভূখণ্ডে ওই তাগিদটাই কখনো জোরালো হয়নি। তা নইলে ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আন্দোলনের কালে জীবনকুশলতার ও জনকল্যাণের কোনো বস্তুগ্রাহ্য মাপকাঠি আমাদের অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান যে তুলনায় নিচু ছিল, তা হিসাব কষে তুলে ধরা সহজ হয় না।

ভারতবর্ষে প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজের অন্তর্জাত সম্পর্ক দীর্ঘকাল — অতি দীর্ঘকাল — একটা স্থিতিশীল অবস্থায় থেকে গেছে। তার মূলে রয়ে যায় বর্ণ-কর্ম বিভাজন। তাতে বৈষম্য থাকলেও তা কখনো অসহনীয় হয়ে ওঠেনি। উৎপাদন-ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যে চিড় ধরেনি। গৌতম বুদ্ধের বৈপ্লবিক আহ্বানও বিপুল সাড়া জাগিয়ে আবার ওই ব্যবস্থাতেই মিশে গেছে। পাঠান-মোগল-ইংরেজ, কেউই একে ভাঙেনি। ভাঙতে চায়নি। বরং নিজেরাই তার সঙ্গে আপস করেছে। জীবনপ্রবাহ কালপ্রবাহের সঙ্গে সমলয়ে থেকে নিস্তরঙ্গ এগিয়ে গেছে। ইয়োরোপের প্রোটেস্টান্ট চ্যালেঞ্জ বা বুর্জোয়া উত্থানের মতো বাস্তব পরিস্থিতি এখানে তৈরি হয়নি। তার অনিবার্যতা ভেতর থেকে গড়ে ওঠেনি। মানুষ আরামে না থাকলেও নিশ্চিন্ত থেকেছে। কোনো অনিশ্চয়তা বা অস্থিরতা চায়নি। এর প্রধান কারণ জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় তখনও কৃষিজমির যথেষ্ট প্রাপ্তিযোগ্যতা। রাজপুরুষের জুলুম যে কোথাও ছিল না, তা নয়। তবে তা সব মিলিয়ে সহনীয় পর্যায়েই ছিল। বেশি জবরদস্তি করলে কৃষক অন্য এলাকায় অন্য জমি খুঁজে নিত। রাজস্ব আদায় তাতে কমে যেত। কাজেই রাজাকেও সংযত ও সতর্ক থাকতে হতো। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা ছিল না। শীত-গ্রীষ্ম, কোনোটিই জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেনি। জলাভূমি ও বনাঞ্চল খাবারও জুগিয়েছে অকৃপণভাবে। প্রকৃতিকে তাই এখানে বিশ্বাসঘাতিনী কল্পনা করা অতি কৃত্রিম হয়ে পড়ে। রোমান্টিক হতে চাইলেও তার প্রেমময়ী-করুণাময়ী প্রতিমা ভেঙে ফেলা সহজ হয় না। ভাঙার ইচ্ছাটাই জাগেনি। রবীন্দ্রনাথেরও না। বরং রোমান্টিক ভাবনায় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায় প্রকৃতির আশ্রয়ে যে অবলম্বন খোঁজা, তাই নির্বিশেষ ও শাশ্বত মনে হয়েছে।

তবে প্রাচ্যের জীবনবোধের যে ধারণা শিলীভূত আকার পায়, তা সবটাই সত্য নয়। অচলতা ও অন্তর্মুখিনতা আবশ্যিকভাবে তার চিরকালের বৈশিষ্ট্য ছিল না। রাষ্ট্রবিপ্লব ও সামাজিক বিশৃংখলা এক সময় আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে তাদের প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু কখনোই তারা অপ্রতর্ক্য হয়ে ওঠেনি। বিপরীতে বাইরের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ ও অবিরাম মিশ্রণ তাতে ঘটে চলেছে। বর্ণ-বিভাজনের চলমান প্রক্রিয়া তার বৈচিত্র্যকে শুষে নেয়। তাই তার

ছাপ তেমন ধরা পড়ে না। কিন্তু এর প্রভাব অন্তঃসলিলা। রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় যে মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করেন, তাতে তার মর্মকথাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এ রোমান্টিক নয়। বুর্জোয়া-বিপ্লবের সংঘাত-দীর্ণ আর্তআকুতি এতে কোনো তীব্রতা আনে না।

কিন্তু গোটা উনিশ শতক জুড়ে এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের ভারততত্ত্বের নির্মাণ যে এদেশের ভাবনা-জগৎকেও প্রভাবিত করে, তা অস্বীকার করা যায় না। সবটাই তার অশ্রদ্ধেয় নয়, কিন্তু এখানকার মানুষ তাদের ঐকান্তিক শ্রেয়ভাবনায় জাগতিক সুখ-দুঃখে বিগতমন-বিগতস্পৃহ, পার্থিব অর্জন নয়, আধ্যাত্মিক মোক্ষই তাদের লক্ষ্য, কারণ, ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মায়া, এবং সুন্দরের অনুভব বুদ্ধির অগম্য, এই রকম আরোপিত গৌরব পরাভূত জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের অনেককে আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল করে। তেমনি বাস্তব সমস্যায় আমরা উদাসীন থাকলে ঔপনিবেশিক রাজশক্তিরও দেশ শাসনের কাজ যথেষ্ট সহজ হয়ে যায়। লক্ষণ-বিচার যে সবটা ভ্রান্ত ছিল, তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু এ ছিল সমগ্রের ভগ্নাংশ মাত্র, যদিও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথ একে মেনে নেন না। প্রাচীনতার সংস্কারকে জঞ্জাল বলেই মনে করেন।[১১] কিন্তু ভারত গৌরবে একাত্ম হতে তাকে প্রত্যাখ্যানও করেন না। ফলে ইয়োরোপীয় রোমান্টিকতায় তিনি পুরোপুরি মগ্ন হতে পারেন না, এক করুণ রঙিন মধুর স্বপ্নের মায়াজাল তিনি ছড়ান, কিন্তু প্রবল আসক্তির ইন্দ্রিয়ঘন প্যাশন তাতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে না। এমনটিই প্রাচ্যবোধের সঙ্গে যথাযথ খাপ খায় বলে বিদ্বৎসমাজ একে সাড়ম্বরে স্বীকৃতি দেন।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে ইহবাদিতাও যে বরাবর অঙ্গাঙ্গি বোনা ছিল এ বিষয়টি ফলে অনেকখানি আড়ালে চলে যায়। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* রাষ্ট্র-অর্থনীতির সম্ভবত প্রথম আকরগ্রন্থ।[১২] সমাজ-বাস্তবতার নিরাবেগ ব্যাখ্যাও মেলে তাতে। নারীর অধিকারও তার বিবেচনার বিষয়। খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ বছর আগের এই সমাজদর্শন এখনও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। একই রকম আকর্ষণীয় রয়ে গেছে পঞ্চম শতাব্দীর ধ্রুপদী কীর্তি বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*। একই সময়ে কালিদাসের কাব্য কামনার তপ্তসংরাগে তুমুল। আরো চার-পাঁচশ বছর পরের কোনারক ও খাজুরাহোর ভাস্কর্যের অলজ্জ মহিমা আজকেও মানুষের মনে উন্মত্ত বিস্ময় জাগায়।[১৩] ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টি এদিকে সেভাবে পড়েনি। তাঁরা ভারতবর্ষের মরমী চেতনার, অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, একটা পূর্ণাঙ্গ ভাবরূপ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। তাঁদের দেখাদেখি এদেশের মানুষও নিজেদের সেইরকম ভাবতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি তাঁদের দলে ভেড়েননি। কিন্তু তাঁরা যে তাঁকে প্রভাবিত করেছেন, এতে সন্দেহ নেই। আমরা দেখি, *উপনিষদে* তিনি গভীরভাবে নিষিক্ত, কিন্তু *অর্থশাস্ত্র* তাঁকে উৎসাহিত করে না। অজন্তা-ইলোরার বৌদ্ধ ও শৈবভাস্কর্য তাঁর সুন্দরের কল্পনাকে সীমা-অসীমের প্রান্তে প্রসারিত করে, কিন্তু খাজুরাহো-কোনারক তাঁকে উত্তেজিত করে না। ভিকটোরীয় ব্রিটিশ শুচিবায়ুগ্রস্ততা তাঁর সুন্দরের বস্তুগ্রাহ্য ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকতে পারে। পাছে তারা নাক-সিঁটকায়,[১৪] এ জন্যে সংকোচও থাকতে পারে। কিন্তু একে প্রাচ্যের চারুশীলতা বলা যাবে না কোনো মতেই। ই. এম. ফরস্টার-এর *A Passage to India* আমরা পড়েছি।

এইখানেই মৌলিক প্রশ্ন একটা উঠে এসে আমাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। প্রাচ্যের যে নিখাদ-নিঃশর্ত পরিচয় আমরা নিজেদের শরীরে বয়ে বেড়াই বলে বড়াই করি, তা কি যথার্থ? কিছু সত্য যদি তাতে থেকেও থাকে, তবু তা কি যথেষ্ট? একইভাবে প্রশ্নটা কি প্রতীচ্য নিয়েও করা যায়? আসলে এই বিভাজনটা কতটা যৌক্তিক? যদি কখনও তা অর্থবহ মনে হয়, তবে তা কি ওই বিশেষ সময়ের কারণেই, না কি তা সময়নিরপেক্ষ — চিরকালের এক অপরিবর্তনীয় বাস্তব?

ইতিহাসে আমরা যতদূর জানি, সেই দূরতম কালপর্ব থেকেই এই উপমহাদেশে বহিরাগতদের আগমন। বেশির ভাগই পশ্চিমের পথে। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের পর ইয়োরোপের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। নিকটতর পারস্য পরিচিত ছিল আগে থেকেই। এ সবের ছাপ পড়ে ভারতবর্ষের মননে; পড়ে তার জীবনভাবনায়, জীবনকলায়। তক্ষশীলার ভাস্কর্য প্রবলভাবে গ্রীক প্রভাবিত। অজন্তা-ইলোরা আত্মস্থ করে বাইরের ভাবনা-কলা। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র-কথামৃত ও গ্রীক ঈশপের গল্প কি উঠে এসেছে একই উৎস থেকে? অথবা তাদের চলাচল কি ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক — লেনদেনের হিসাব-নিকাশের কথাটাও ছিল অর্থহীন? আমরা জানি, পঞ্চম শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্যভট্টের যুগান্তকারী কীর্তি (Amartya, 2005 : 100-101) অনেক পরে আরব-বিশ্ব হয়ে ইয়োরোপে পৌঁছেছিল। তার আগে অন্ধকার যুগ রাজত্ব করেছে ইয়োরোপেও। ক্রুসেডের যুদ্ধে হার-জিতের মীমাংসা মেলা কঠিন।[১৫] কিন্তু আরব জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় ইয়োরোপীয় ভাবুকদের কাছে চিন্তার দরজা খুলে দেয়। অন্যদিকে রণক্লান্ত আরব জনগণ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে, অথবা পুব দিকে সহজ অভিযানের পথ খোঁজে। ভারতবর্ষে তাদের ধর্ম-সংস্কারের অহংকার প্রবল ছিল, কিন্তু সৃষ্টিশীলতা সে অনুপাতে চিন্তা ও কর্মের দিগন্ত প্রসারিত করেনি। ইয়োরোপে ফরাসি বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব এক অভাবিতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা করে। তার প্রভাব পড়ে সর্বত্র। জীবনযাত্রার চেহারাও আমূল বদলে যেতে থাকে। কিন্তু একে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠত্বের চিরকালের বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নেওয়া ঠিক নয়। মানুষের ইতিহাসের বিকৃত পাঠই তাতে প্রশ্রয় পাবে। আমরাও অন্ধের হাতি দেখার মতো হাতড়ে বেড়াব। মানব বিশ্বে সৃষ্টি ও সভ্যতার স্ফুরণ এক এক সময় এক এক জায়গায় ঘটেছে। কারো খেয়াল খুশিতে নয়। কোনো মানব গোষ্ঠীর দৈবনির্দেশিত শ্রেষ্ঠত্বের কারণেও নয়। বস্তুগত অবস্থা বিশেষ বিশেষ জায়গায় 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'র অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠেছে তাই। এই ভাবে ফরাসিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব ইয়োরোপের সৃষ্টিশীল কর্মপ্রতিভাকে গোটা ইয়োরোপের নয়, অধিকাংশ ইয়োরোপীয় জনগণেরও নয়, একসময় পৃথিবীর সব মানুষের সমৃদ্ধির প্রেরণার উৎস করে তুলেছিল। সেকারণেই তাকে চিরকালের গুরু মানায় পরাধীন জীবনে একধরনের দায়িত্বহীন সুখ বিলাস আছে। আমাদের এ অঞ্চলেও তার পরিচয় মেলে বিলক্ষণ। সবটাই যে তার নিন্দার, অথবা কাণ্ডজ্ঞানহীন অনুকারিতার, তা অবশ্য নয়। মানব অভিজ্ঞতার বহমান কাণ্ডগুলো প্রায়শই সতানৃতে, তাৎক্ষণিকভাবে উচিত-অনুচিতে মেশামেশি করে থাকে।

দ্বিতীয় কার্যকারণের বিশেষ এক ধারার কতিপয় উদাহরণ সামনে এনে তার ভিত্তিতে প্রাচ্যের সামান্য লক্ষণের পরিচয় ঘোষণা করায় যৌক্তিক প্রমাদ ঘটার যথেষ্ট অবকাশ থেকে

যায়। আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনাকেও তা আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে; এবং ভ্রান্তির রাজত্ব অনর্থক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। অধ্যাত্মবাদী পরলোকমুখী কল্পকথার যে অনুসরণযোগ্য নির্দেশনামা অনেকের কাছে মান্যতা পায়, তাকেই প্রাচ্যের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় মনোজাগতিক রূপকাঠামো ভাবায় বিস্তর ফাঁকি ঢুকে থাকে। চিন ও দূরপ্রাচ্যের সভ্যতার ঐতিহ্য ভারতীয় উপমহাদেশের চেয়ে কম গৌরবের নয়। সেসব অঞ্চলে বৌদ্ধ ও কনফুসিয় দর্শন সর্বতোভাবে ইহজাগতিক। (Manfred, 1974 : 50)। অতীত কীর্তি তাদের এখনও সম্ভ্রম জাগায়। তবু আঠারো উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় বিপ্লব প্রাচ্য ভূমি চিনে ঘটে না। আবার বিশ শতকে চিনা বিপ্লব ইয়োরোপে ঘটে না। প্রত্যেক জায়গার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে অতি উৎসাহে পরমুখাপেক্ষী হলে তাতে কতটা নতুন প্রাণের জোয়ার আসবে, ওই মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা কতটা জাগ্রত হবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষই থেকে যায়। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের প্রাচ্যের ধারণা যে যথার্থ ও সম্পূর্ণ নয়, মনোভূমি ও কর্মভূমির একপেশে রূপমাত্র যে সেখানে প্রাধান্য পায়, ফলে খণ্ডই পূর্বের নকল সেজে বসে, একথাটিও আমাদের মনে রাখতে হয়।

এবার রবীন্দ্রনাথে আবার ফিরে আসি। পাশ্চাত্যের রোমান্টিক ঘোর যে তাঁর কোনোদিন কাটেনি, তা বলে গেছেন তিনি নিজেই। রোমান্টিক প্রেম ও সুন্দরের অনশ্বর কল্পরূপ তাঁকে টেনেছে। এই টানা ও তা পুরোপুরি না পাওয়ার অতৃপ্তি সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু অসহ্য সুন্দরের সর্বনাশা বিভীষিকা তাঁর হৃদয় কুঁরে কুঁরে খায়নি। ইয়োরোপীয় রোমান্টিকতার সঙ্গে একটা দূরত্ব তাঁর তৈরি হয়েছে এখানে। কালিদাস তাঁর মধ্যে স্বপ্নাতুর অপূর্ণতার অতৃপ্তি জাগায় না। অতৃপ্তি তাঁর না পাওয়ার বেদনার। একে রবীন্দ্রনাথ ডুবিয়ে দেন শান্তি-অনন্ত-আনন্দের আস্বাদনে। তা অবশ্যই তাঁর প্রাচ্য ঘরানার, কিন্তু একে প্রাচ্যবাণীর সারাৎসার বললে তা অতিশয়োক্তি হবে।

আমরা দেখেছি, তাঁর *গীতাঞ্জলি* খণ্ডকালের জন্যে হলেও পশ্চিমের পাঠককুলকে অভিভূত করেছিল। যে কোনো পাঠক নয়, কবিতার মর্মার্থী অতি সপ্রাণ পাঠক। হিমেনেথ, আদ্রে জিদ, মিস্ত্রাল, স্যঁ জে পার্স, ইয়েটস্, পাস্টেরনাক, এঁরা সবাই একসময় ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। শুধু প্রাচ্যের সারকথা উচ্চারণ করেছিলেন বলে নয়, কবিতায় প্রতীকে, রূপকল্পে, গদ্য-ছন্দের অন্তর্লীন টানে তাঁরা যা ভাবতে চেয়েছেন, তাকেই অনায়াসে তিনি প্রাণময়ী করে তুলেছেন বলে। নান্দনিক এই সার্থকতায় পাশ্চাত্যের কবিতা চর্চায় নেতৃত্ব দেবার সুযোগ তাঁর এসেছিল। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে নয়, আপন সত্য অনুভবের প্রকাশ ঘটিয়ে। কিন্তু এই সম্ভাবনা তিনি উপেক্ষা করেছেন।

বিশ্বমানব-চিন্তাবিদ, এই পরিচয়টিই তাঁর বড় হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসুকে খুশি করে পাশ্চাত্যের বিপন্ন-বিষণ্ন কবির তালিকায় তিনি নাম লেখাননি। তাতে তাঁর আপত্তির কথাটাই তিনি বরং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। ছবি আঁকায় সমকালীন ইয়োরোপীয় শৈলীর ব্যাপারে তিনি যে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা অনুমান করা চলে। কিন্তু তারই অনুসরণে তিনি ছবি এঁকেছেন, এটা নিশ্চিত করা যায়। যতদূর জানা যায়, ওকাম্পো উৎসাহ দেবার আগে চিত্রকর হিসেবে আত্মপ্রকাশে তাঁর কোন আগ্রহই গড়ে ওঠেনি। (মাহমুদ, ২০১১)।

খেয়ালখুশির আঁকিবুকিতে সচেতন পরিকল্পনা কিছু ছিল না। তাঁর নিজস্ব ছন্দ-জ্ঞান ও রঙের অশিক্ষিত স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারও তাতে মিশে গিয়েছিল। হয়ত পরে ওই সময়ের এক জাতের ইয়োরোপের ছবির সঙ্গে মিলের ব্যাপারটি তার চোখে পড়ে থাকবে। তাতে বড় জোর উভয়ের তাগিদের মূল জায়গায় অন্তর্মিল রয়ে গেছে, এইটুকুই বলা যেতে পারে। তিনি পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেছেন, এটি প্রমাণ হয় না। তাছাড়া তাঁর ছবিতে প্রতিটি বিষয়ের সীমানা শাদা দিয়ে আলাদা করে তার চারিত্র্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এটি একান্তই তাঁর নিজস্ব। পাশ্চাত্যের প্রভাব এতে ধরা পড়ে না। এক অসামান্য সৃষ্টিশীল প্রতিভা তাঁর সময়ের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, খাপছাড়া উৎপাত ও অসংগতি, এ সবই চেতনায় ধারণ করে যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা না করে তাদের মতো তাদের ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। — এইটুকুই যা বলবার। তবে তাঁর সময়কে বাদ দিয়ে নয়। তা প্রবলভাবে বর্তমান।

আরো দেখি, তিনি ইয়োরোপীয় সমসাময়িকদের প্রতি রোমান্টিকতার দৃষ্টি আকর্ষণকারী আস্ফালনে মাতেন না, কিন্তু আগের মতো কোনো কান্তিময়ী তুলনাহীনা লাবণ্যপুঞ্জের সস্পৃহ রূপমায়াও রচনা করেন না। তাঁর মত বদলেছেন তিনিও। স্থান ও কাল, দুই-ই তার নিয়ামক। সাহসের সঙ্গে তিনি তাদের মুখোমুখি হন। তবে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের বিভক্তি-রেখা মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। তা নইলে কেন তিনি শেষ জন্মদিনের ভাষণে মহামানবের আগমনের আশায় প্রাচ্যভূমির দিকে মুখ করে অপেক্ষা করে থাকার কথা জানাবেন?[১৬] বাস্তবতার রূপমায়া বহুরূপে-বহুভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় প্রেক্ষাপটেই ক্রমাগত উন্মোচিত হয়ে চলে। কে কীভাবে সাড়া দেয়, সেইটিই দেখবার। এবং কাল নিরবধি। কোথাও শেষ কথা কিছু নেই। শ্রেষ্ঠত্বের বা মহত্ত্বেরও পালা বদলায়।

টীকা

১. বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী', *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৫১-১৬২

২. রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী বিতর্ক নিয়ে আমাদের ধারণায় মোটামুটি সহমত একটা গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে বাঙালি চিন্তাবিদদের ভিতরে, এবং তাতে রবীন্দ্রনাথকে প্রাগসর ও মুক্তমনা এবং গান্ধীকে প্রাচীনমুখী ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী হিসাবে দেখানোর দিকে ঝোঁকটা বেশ প্রবল। গান্ধী চরকাকে হাতিয়ার করে আন্দোলনে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একমত হননি। তিনি এর কোনো অর্থনৈতিক সার্থকতা খুঁজে পাননি। আরো লিখেছিলেন, চরকা কাউকে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে না। এতে সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটে না। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস বিদেশি-কাপড় পোড়ানো নিয়ে মর্মান্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। অমর্ত্য সেন গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এও তিনি দেখিয়েছেন, অর্থনীতির হিসাবেও চরকার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বিপুল ভর্তুকি দেওয়া ছাড়া তাকে টিকিয়ে রাখার উপায় নেই।
(দেখুন, Amartya Sen, 2005 : 100-101.)
তবে গান্ধীর নৈতিক ও যৌক্তিক ভূমি অসার ছিল না। তাঁর চরকা-আন্দোলন একটা প্রতীকী তাৎপর্য পায়। পেছনে থাকে সর্বাত্মক গ্রামীণ সমাজের ও অর্থনীতির উদ্যোগ ও উত্থান ভাবনা। যেখানে বাইরের বিনিয়োগ নেই — কারণ বাইরের বিনিয়োগ ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুকূলে নয় — সেখানে বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানে ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইতে হুজুগে মেতে খাপছাড়াভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নয়, সবাই মিলে শ্রমনির্ভর কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ উদ্ধারের

একটা পথ অবশ্যই। গান্ধী নিজে বলেছেন, ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চরকার পক্ষে তাঁর প্রাথমিক যুক্তি। তবে বিশ শতকের প্রথমদিকের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটটাও মনে রাখা দরকার। এ কারণে এই কৌশলের যৌক্তিকতা আপেক্ষিক। কোনো পন্থাই কোনো মৌলিক ও স্থির সত্যের অধিকার দাবি করতে পারে না। একুশ শতকের গোড়ায় এর গুরুত্ব ম্লান।

আরো একটা বিষয় খেয়াল করবার। গভীরভাবে বিচেনা করলে রবীন্দ্রনাথ নন, গান্ধীই এখানে অনেক বেশি পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। তার একরকম সৃষ্টিশীল প্রযোগ ঘটিয়েছেন তিনি। দুই দশক পরে কেনইনস্‌ও ভিন্ন বাস্তবতায় – ভিন্ন মাত্রায় পাশ্চাত্যে ভাবগতভাবে অনুরূপ কৌশল (কর্মসংস্থান উদ্যোগ) অবলম্বন করার কথা বলেন।

৩. এড্‌গার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯); ওয়াল্‌ট্‌ হুইটম্যান (১৯১৯-৯১)।

রোমান্টিক সুন্দরে ক্ষয় ও বিনাশের সম্মোহন দানা বেঁধেছিল এডগার অ্যালন পো'র ভাবনা-কল্পনায়। রহস্যের মায়াজাল তাকে ঘিরে রেখেছিল; তার আকর্ষণকে অপ্রতিহত করে তুলেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এই অ্যালান পো এক বিশাল প্রেরণা হয়ে ইয়োরোপীয় কবিতায় সৃষ্টিশীলতার মূল ধরে নাড়া দেন। ইয়োরোপের রোমান্টিকতায় তা নতুন মাত্রা যোগ করে। তবে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্যের অহংকার ও বুর্জোয়া সম্পন্নতা তাকে প্রবল করে না। রবীন্দ্রনাথের দু-একটি ছোটগল্পে, যেমন, 'ক্ষুধিত পাষাণে' তাঁর কল্পনার ছাপ পড়ে থাকতে পারে। ইংরেজি ভাষার সংযোগই অনুঘটকের কাজ করে বলে মনে হয়। তবে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অ্যালান পো'র সহচর হয়েছেন, এমনটি বলা যথার্থ হবে না।

হুইটম্যানের এই পঙক্তিগুলো লেখা রবীন্দ্রনাথের জন্মেরও আগে — সম্ভবত উনিশ শতকে চল্লিশের দশকেই :

I am the poet of slaves, and of the masters of slaves,
I am the poet of the body and I am the poet of the soul,
The pleasures of heaven are with me
and the pains of hell are with me,
But first I graft and increase upon my self,
the latter I translate into a new tougue.

রবীন্দ্রনাথ এদের পড়েছিলেন কি না জানি না। অথবা নজরুল? তবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা 'প্রভাতউৎসবে' এদের অনুরণন বাজে। বাজে নজরুলের 'বিদ্রোহী'তেও। হতে পারে, চেতনার একই উৎস থেকে এরা উৎসারিত। বাস্তবের প্ররোচনা বিভিন্ন পটভূমিতে চেতনায় একই রকম সাড়া জাগিয়ে ওই উৎসমুখ খুলে দেয়।

৪. শুরুতে, অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমভাগে এদেশেও ইয়োরোপীয় ক্লাসিক পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল। এবং তা ক্লাসিক ভাষাতেই। ইংরেজি সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেনি। শিক্ষানীতিও এককভাবে কার্যকর হয়নি। এই পরিস্থিতির প্রভাব লক্ষ করি মাইকেলে। তবে ওই ব্যবস্থার কোনো সুবিন্যস্ত ও সর্বব্যাপ্ত প্রয়োগ ছিল না। তাতে আগ্রহও ছিল খাপছাড়া কতিপয় জনের। ১৯৩৩-এ বেন্টিংক মেকলের শিক্ষানীতি এককভাবে ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তবে দেশজ ঐতিহ্যে ভারতীয় ক্লাসিকের চর্চা তাঁর পরিবারে অব্যাহত থাকে।

৫. দেখুন, E. J. Holesbawm, 1984 : 307-335.

৬. মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, ২৬ আগস্ট, ১৭৮৯, বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই ফরাসি গণপরিষদে গৃহীত।

৭. 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'
রবীন্দ্রনাথ, 'প্রভাত-উৎসব', প্রভাতসংগীত, ১৮৮৩
ইয়োরোপীয় রোমান্টিকতার ওই আবেগই রবীন্দ্রনাথকে উদ্বেলই করেছে।

৮. J. W. Von Goethe, *Faust*, Part II, Penguin Classics, Penguin Books, England, 1969, p. 157-214.

হাইনে (Hinei 1797-1856) ওই ফাউস্টের কামনার আলোয় পাতালপুরী থেকে হেলেনকে জাগিয়ে তুলে তার সুন্দরের বৈনাশিক আকর্ষণের বাক-প্রতিমা রচনা করেন :

You conjured me up from the grave by your magic will, you reanimated me with the glow of your desire, now you caunot quench the glow. Press your mouth upon my mouth, the breath of human beings is divine. I will drain your soul, for the dead are insatiable.

দেখুন, Ernest Fischer, *The Necessity of Art*, Penguin Books, 1970, p. 174.

৯. রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান*, পূজা পর্বের ১৯৯ সংখ্যক খান। এ গান ইয়োরোপীয় রোমান্টিক নয়। উত্তর রোমান্টিক অপ্রেমের নয়, আবার প্রাক্-রোমান্টিক ভারতীয় ক্লাসিকেও স্থির নয়। এ রাবীন্দ্রিক। বাস্তবে নিবিষ্ট থেকে সেখান থেকেই তার উত্তরণের পথ খোঁজা। — 'জড়তার জর্জর বন্ধ' থেকে মুক্তি খোঁজা।

১০. মার্টিন লুথার জর্মানিতে রিফর্মেশন আন্দোলন শুরু করেন ১৫১৭ সালে। যাজকতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তি ও ঈশ্বরের সরাসরি যোগাযোগের কথা তিনি বলেন। জাঁ কেলভিন ছিলেন রিফর্মেশনের অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি প্রচার করেন, বিনিয়োগ করা অধিক ধনী হওয়া কোনো অপরাধ নয়।

১১. তিনি ঢাকায় যখন আসেন, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, "জীর্ণতাই আবর্জনা; জীর্ণতাই যাত্রাপথের বাধা'। দেখুন, তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা' প্রবন্ধ।

১২. আনুমানিক ৩২৪ খ্রি. পূর্বাব্দ – পরবর্তী সময়। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ওই সময়ে। প্রথম মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ছিলেন কৌটিল্য বা চাণক্য। *অর্থশাস্ত্রে* পড়ি তাঁর সাহসী উচ্চারণ, 'যেখানেই ধর্মের বিধানের সঙ্গে যুক্তির বা কাণ্ডজ্ঞানের বিধানের বিরোধ ঘটবে, সেখানেই যুক্তিকে প্রামাণ্য বলে ধরতে হবে।' (শামাশাস্ত্রীর অনুবাদ)। দেখুন, W. H. McNell, 1963 : 331.

১৩. খাজুরাহো (দশম শতাব্দী), কোনারক (ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

১৪. দেখুন, Partha Mitter, 1977.

১৫. ক্রুসেডের প্রথম যুদ্ধ (১০৯৬-১০৯৯), দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৪৭-১১৪৯), তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯-১১৯২), শেষ ক্রুসেড (অষ্টম) (১২৭০)।

১৬. শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মনুষ্যত্বের পরাজয়ে ভরসা হারাতে হারাতেও তিনি স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করেন, '... আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে, আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকে। '... আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।' 'সভ্যতার সংকট', ১ বৈশাখ, ১৩৪৮

বোঝা যায়, পুব-পশ্চিম, এই পরিচয় বৈশিষ্ট্য অবচেতনে হলেও তাঁর মাথায় কাজ করে চলে। এবং সেখানে সম্পর্কটা তাঁর কাছে দেয়া-নেয়ার। শুধুই নেবার নয়। প্রতীচ্যে মিশে যাবারও নয়। জীবনাবসানের প্রাক-মুহূর্তে ঘোর অমানিশায় তিনি মনে করেছেন, এখানে প্রাচ্যেরও কিছু দেবার আছে। তা মানবিক মূল্যবোধের ও পারস্পরিক সহমর্মিতার জীবনপাথেয়। এই মনে করা অতি-সরলীকরণে, অতিবিশিষ্টতায় আক্রান্ত কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে তিনি পক্ষপাতহীন আত্মমর্যাদাবোধ পোষণ করে চলেছেন সারা জীবন। তা তাঁর কবিতাতে সৃষ্টিশীল নিজস্বতা এনেছে। ইয়োরোপের অনুকরণ তিনি করেননি। অকুণ্ঠে সেখান থেকে গ্রহণ করতেও তাঁর বাধেনি। ওই 'আকাঙ্ক্ষা'-রচনাতেই তাঁর স্মরণীয় উক্তি, 'যে দিতে পারে, সে-ই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।' 'ভারততীর্থ'তেও বলেছেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে –।' তিনি নিতে চান ঠিকই। তবে বাছ-বিচার না করে নয়। নিজের শ্রেয়বোধ জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। ওই শ্রেয়বোধ বাস্তবে ধ্রুব কি না, সে অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু তিনি তাকে তাঁর সত্য-সুন্দর ও

ন্যায়ের এক চলমান ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। উৎকট অনাসৃষ্টিকে অথবা অসংযমের আস্ফালনকে তা প্রশ্রয় দেয় না। ছবি আঁকাতেও না। অন্তর্লীন ছন্দবোধ সেখানেও সক্রিয়; — যদিও তার ধরন-ধারণ ভিন্ন। তাঁর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ রেখা সেই অনুযায়ী পথ খোঁজে। মর্মার্থীই থাকতে চায়। তবে শুভার্থী হয়ে।

গ্রন্থপঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায়, ১৯৬২। *রবীন্দ্রনাথ*, ডি.এম.লাইব্রেরী, কলকাতা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, ১৯৯৫। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৬৩। *সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মাহমুদ আল জামান, ২০১১। *রবীন্দ্রনাথ : চিত্রকর*, মূর্ধণ্য, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৭। *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৪। *সঞ্চয়িতা-২*, পশ্চিমবঙ্গ আকাদেমি, কলকাতা।

A.Z. Manfred (ed.), 1974. *A Short History of the World*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow.

Amartya Sen, 2005. *The Argumentative Indian*, Allen Lane, London.

E.J. Hobsbawm, 1984. *The Age of Revolution*, 1789-1848, ABACUS, London.

Ernest Fischer, 1970. *The Necessity of Art*, Penguin Books, England.

J.W. Von Goethe, 1969. *Faus,* Part II, Penguin Books, England.

Partha Mitter, 1977. *The Much Malignd Monters : History of European Reactions to Indian Art*, Oxford, London.

W.H. McNell, 1963. *The Rise of the West*, The New American Library, New York.